সম্পূর্ণ উপন্যাস

ছবি: নির্মলেন্দু মণ্ডল

ডাক রহস্য

সুকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়

বাইরে বৃষ্টি ক্রমশ বাড়ছে। ঝিনুক বসে রয়েছে দীপকাকুর অফিসে। পিছনে কাচ ঢাকা জানলা দিয়ে দেখা যাচ্ছে, চারতলার নীচে ক্যামাক স্ট্রিটে জল জমতে শুরু করেছে। এই বৃষ্টিতে দীপকাকুর ক্লায়েন্ট এলে হয়। ঝিনুকের কলেজে এখন পুজোর ছুটি চলছে। সেটা জানেন বলেই, দীপকাকু সকালে ফোন করে বললেন, "আজ একটা ইন্টারেস্টিং সাবজেক্টের কেস আসছে। অনেক কিছু শিখতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পারবে। এগারোটা নাগাদ চলে এসো অফিসে।"

বাড়ি থেকে বেরনোর সময় বৃষ্টি অল্প ছিল। বাবা বলেছিলেন, গাড়ি নিয়ে যেতে। ড্রাইভার আশুদা ততক্ষণে এসে গিয়েছে। গাড়ি নেয়নি ঝিনুক, বাবার অফিস যেতে সমস্যা হবে। বাবা জিজ্ঞেস করেছিলেন, "কী নিয়ে কেস, কিছু বলল? ইন্টারেস্টিং বলছে কেন?"

"গিয়ে জানতে পারব," বলেছিল ঝিনুক। ফোনে কেসের সাবজেক্ট জিজ্ঞেস করার মতো ভুল ঝিনুক করবে না। ওর মাথা খারাপ হয়ে যায়নি! দীপকাকু ভেবে বসতে পারেন, অ্যাসিস্ট করার আগে ঝিনুক কেস পছন্দ-অপছন্দ করা শুরু করেছে।

বৃষ্টির মধ্যেই ঝিনুক ট্যাক্সি নিয়ে দীপকাকুর অফিসে সময়মতো উপস্থিত হয়েছে। সাবজেক্টটা জানা গেল, ডাকটিকিট। বিষয়টা মোটেই আকর্ষণ করেনি ঝিনুককে। স্কুললাইফের প্রথম দিকে কয়েকজন বন্ধুকে দেখত ডাকটিকিট জমাতে। এখনকার অল্পবয়সি স্টুডেন্টদের মধ্যে সেই উদ্যম চোখে পড়ে না। তা ছাড়া চিঠি লেখার পাঠ তো উঠতেই চলল। এস এম এস, ইমেলে কাজ সারছে প্রায় সবাই। পোস্টাল ডিপার্টমেন্টটাই না তুলে দেয় সরকার! এর পরও কি ডাকটিকিটকে ইন্টারেস্টিং বিষয় বলা যায়?

ঝিনুক অফিসে ঢোকার পর থেকে দীপকাকু ডাকটিকিটের গুরুত্ব বোঝানোর চেষ্টা করেছেন খানিকক্ষণ। প্রথম ডাকটিকিট ছাপা হয় ইংল্যান্ডে, ১৮৪০ সাল নাগাদ। স্ট্যাম্পটার নাম, 'পেনিব্ল্যাক'। মহারানি ভিক্টোরিয়ার ছবি ছিল তাতে। ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইটে ছাপা। খুব কম সংগ্রাহকের কাছে এই ডাকটিকিটটি আছে। আর্থিক দিক থেকে তো বটেই, সব অর্থেই পেনিব্ল্যাক একটি মূল্যবান সংগ্রহ। ডাকটিকিটকে বলা যেতে পারে সভ্যতার সাংকেতিক ইতিহাস।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সামান্য কিছু তথ্য থাকে তাতে, দাম, দেশের নাম, কোন সালে কী উপলক্ষে প্রকাশ হয়েছে এবং স্মারকের ছবি। ব্যস, ছোট্ট কাগজের উপর ওই ক'টি বিষয়ের মধ্যে ধরা থাকে নির্দিষ্ট সময়কালের ইতিহাস। কখনও মুদ্রণপ্রমাদে কোনও একটি ডাকটিকিটের সিরিজ মূল্যবান হয়ে উঠতে পারে। আমাদের দেশ এবং অন্য অনেক দেশে ডাকটিকিটের এগজিবিশন হয়। নিলামে চড়ে দুষ্প্রাপ্য ডাকটিকিট... মোটামুটি এই কথাগুলোই ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বলে দীপকাকু নিজের কাজে কম্পিউটারে বুঁদ হয়ে গিয়েছেন।

ঝিনুক মাঝে-মাঝে পিছনের জানলা দিয়ে দেখছে, বৃষ্টি কমল না বাড়ল? এখনও একবার দেখে নিয়ে ঘাড় সোজা করতেই, চোখ আটকাল অফিসের মেন দরজায়, ছাতা হাতে আধভেজা হয়ে ঢুকলেন একজন। ইনিই কি ক্লায়েন্ট? পোশাক, চেহারা খুবই সাধারণ। বয়স চল্লিশের নীচেই হবে। দীপকাকুর চেয়ে কিছুটা বড়। মাথার চুল পাতলা, মুখে অযত্নের দাড়িগোঁফ, চশমা, কাঁধে রেক্সিনের ঝোলা ব্যাগ। হাতের ভেজা ফোল্ডিং ছাতাটা নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন ভদ্রলোক। কোথায় রাখবেন, বুঝে উঠতে পারছেন না।

কিচেন স্পেস থেকে বেরিয়ে এল সুদর্শনকাকা, দীপকাকুর অফিসের একমাত্র স্টাফ, এগিয়ে গিয়ে ভদ্রলোকের কাছ থেকে ছাতাটা নিল। দেখিয়ে দিল দীপকাকুর কাচঘেরা কেবিন।

ভেজা পোশাকের কারণে ভদ্রলোক যেন একটু বেশি জড়সড়। অযথা গা থেকে জল ঝাড়ার চেষ্টা করতে-করতে এগিয়ে আসছেন। পুশডোর ঠেলে পা রাখলেন কেবিনে। জোড়হাত করে দীপকাকুকে বললেন, "আমিই উৎপল হাজরা। ফোন করেছিলাম। সরি, লেট হয়ে গেল।"

"ইট্‌স অল রাইট," বলে দীপকাকু হাতের ইশারায় বসতে নির্দেশ করলেন ভদ্রলোককে।

উৎপল হাজরা বললেন, "সকাল থেকে ওয়েদারের যা অবস্থা, বাস-অটো প্রায় অমিল।"

"সরাসরি বাড়ি থেকেই এলেন মনে হচ্ছে।"

গুছিয়ে বসার আগে দীপকাকুর কথায় থমকালেন উৎপল। বললেন, "হ্যাঁ, বাড়ি থেকে এলাম। কেন বলুন তো?"

রিভলভিং চেয়ারে ঠেস দিয়ে দীপকাকু সহজ গলায় বললেন, "না, এখন তো আসলে অফিস আওয়ার, আমি বুঝতে চাইছি আপনার প্রফেশনটা কী?"

সূক্ষ্ম কায়দায় উৎপলবাবুর প্রশ্নটা এড়ালেন দীপকাকু। ভদ্রলোকের চেহারা দেখে দীপকাকু বুঝে গিয়েছেন, উনি বাড়ি থেকে সোজা এখানে এসেছেন। দীপকাকুর প্রশ্নের উত্তরে উৎপলবাবু বলছেন, "কনফেকশনারি আইটেমের ডিলারশিপ আছে আমার। গোডাউন, অফিস দুটোই বাড়িতে।"

"বাড়ি কোথায় আপনার?"

"বেহালা।"

"অনেক ভিতরের দিকে?"

উৎপল হাজরা অবাক হয়ে তাকিয়ে আছেন দীপকাকুর দিকে। জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি কী করে বুঝলেন ভিতর দিকে?"

"সেরকম কিছু না। জাস্ট গেস ওয়ার্ক। নাও মিলতে পারত," বললেন দীপকাকু। কিন্তু ঝিনুক জানে দীপকাকুর আন্দাজ কতখানি অভ্রান্ত! কাউকে শুধু চোখের দেখা দেখে অনেক কিছু বুঝে নিতে পারেন। মুখে সে কথা বলে ব্যক্তিটির কাছ থেকে ক্রেডিট আদায় করতে চান না। এখন করলেন সম্ভবত ক্লায়েন্টকে বাজিয়ে নেওয়ার জন্য। অতি সাধারণ চেহারার, ভবঘুরেমার্কা উৎপলবাবুকে দেখে দীপকাকুর হয়তো সন্দেহ হয়েছে, ফিজ অ্যাফোর্ড করতে পারবেন কিনা? নিজের দাম বোঝাতে ক্ষমতার সামান্য নিদর্শন রাখলেন দীপকাকু। ইতিমধ্যে দীপকাকু আরও দুটো প্রশ্ন রেখেছেন পার্টির কাছে, "প্রথমে বলুন আমার রেফারেন্স কার থেকে পেলেন? তারপর বলুন, আপনার সমস্যা।"

উৎপলবাবু বলছেন, "সরশুনায় জাল উইলের যে কেসটা আপনি সলভ করলেন, ক্লায়েন্ট তো আমার মামাতো ভাই। তার কাছ থেকেই আপনার কথা শুনেছি।"

সরশুনার কেসটার ব্যাপারে ঝিনুক কিছুই জানে না। দীপকাকু ডাকেননি।

উৎপলবাবু জানাচ্ছেন, "আমাকে একজন অজ্ঞাতপরিচয় লেখকের সন্ধান দিতে হবে। তিনি মহিলা নামে লেখেন, পারমিতা গুপ্ত। এটা কি ছদ্মনাম? তিনি পুরুষ না নারী, কিছুই জানি না।"

"একটু ডিটেলে বলুন। কোথায় লেখেন, কী ধরনের লেখা? তাঁকে নিয়ে আপনার সমস্যা কেন?"

উৎপলবাবু একবার ঝিনুকের দিকে তাকালেন, দৃষ্টিতে ইতস্তত ভাব। কলেজছাত্রীর বয়সি ঝিনুককে নিশ্চয়ই দীপকাকুর এজেন্সির কেউ বলে মনে হচ্ছে না তাঁর। ব্যাপারটা বুঝে দীপকাকু আশ্বস্ত করলেন, "আপনি বলুন। ও আমার অ্যাসিস্ট্যান্ট।"

একটু বুঝি বিস্মিত হলেন উৎপল হাজরা। সেটা সরিয়ে রেখে বলতে থাকলেন, "গত পুজোসংখ্যা 'অন্নপূর্ণায়' পারমিতা গুপ্ত একটি রহস্য উপন্যাস লিখেছেন। এই লেখিকার লেখা আগে কখনও দেখিনি। যত দূর সম্ভব খবর নিয়ে জেনেছি, নামটা একেবারেই নতুন। আমার প্রবলেমটা হচ্ছে, এই উপন্যাসটা একটা রেয়ার ডাকটিকিট চুরি নিয়ে লেখা। নামটা বাদে চোরের সমস্ত বিবরণ আমার সঙ্গে মিলে যায়। আমার চেহারা, পেশা, বাড়ির লোকেশন এবং অবশ্যই ডাকটিকিট জমানোর নেশা।"

"ভেরি ইন্টারেস্টিং!" বলে সোজা হলেন দীপকাকু।

"এ তো কিছুই না। পরের অংশ শুনলে আরও চমকে যাবেন," বলে পরবর্তী অধ্যায় গেলেন উৎপল হাজরা। বলতে থাকলেন, "শুধু চুরি নয়, একজন সংগ্রাহককে খুন করে চুরি। সেই সংগ্রাহকও সত্যিকারের। তাঁরও নাম বাদে বাকি সব বাস্তবের সঙ্গে মেলে। তিনি আমার অত্যন্ত চেনা, বলা যেতে পারে ডাকটিকিট সংক্রান্ত বিষয়ে আমার শিক্ষকতুল্য!"

"তিনি নিশ্চয়ই জীবিত?" জানতে চাইলেন দীপকাকু।

উৎপল হাজরা মাথা নেড়ে বললেন, "না, তিনি মারা গিয়েছেন। তবে নর্মাল ডেথ। হার্টের প্রবলেম ছিল, হার্ট অ্যাটাকেই মৃত্যু।"

"তা হলে তো আপনার সমস্যাটা আর তত গুরুতর রইল না। খুন যখন হয়নি, উপন্যাসের খুনির সঙ্গে আপনার মিল নিয়ে মাথা ঘামিয়ে কী লাভ?"

"প্রবলেমটা খুন নিয়ে নয়, রেয়ার ডাকটিকিটটা নিয়ে। উপন্যাসে যেটা চুরি হয়েছে। ডাকটিকিট সম্বন্ধে আগ্রহীরা ধরে নিচ্ছে, সংগ্রাহকের মৃত্যুটা লেখিকার কল্পনা। চুরিটা সত্যি। ওই রেয়ার স্ট্যাম্পটা এখন আমার কাছে আছে।"

"সংগ্রাহক যে খুন হননি, আগ্রহীরা কী করে জানছেন?"

"আসলে আমরা যারা ডাকটিকিটের ব্যাপারে উৎসাহী, পশ্চিমবঙ্গে তাদের সংখ্যা নগণ্য। ফলে আমাদের রাজ্যের ডাকটিকিট-উৎসাহীরা একে অপরকে ভালমতো চিনি। সংগ্রাহকের মৃত্যু কীভাবে হয়েছে, তা সকলেই জানে। তাই ধরে নিচ্ছে ওটা কল্পনা। স্ট্যাম্পটার ব্যাপারে যেহেতু কিছুই জানে না, ওটাকে সত্যি বলে মনে করছে।"

"না জেনে সত্যি বলে মনে করার কারণ?"

"কারণ, ওই ডাকটিকিটটা। যেটার কথা লেখা হয়েছে উপন্যাসে। ওটা একেবারেই রেয়ার। ডাকটিকিট-সংগ্রহকারী এবং উৎসাহীরা ওই স্ট্যাম্পটার হদিশ পেতে চাইবেই। ডাকটিকিটের প্রতি ঝোঁক মারাত্মক ব্যাপার। অন্ধবিশ্বাসে মানুষ যেমন গুপ্তধন খোঁজে, ডাকটিকিট-উৎসাহীরা খোঁজে রেয়ার স্ট্যাম্প। ওই উপন্যাসটা তাদের বিশ্বাসকে আমার দিকে ঘুরিয়ে দিয়েছে।"

দু'জনের কথা মন দিয়ে শুনে যাচ্ছে ঝিনুক। ডায়েরি, পেন বের করে ফেলেছে। এখনও পর্যন্ত নোট নেওয়ার মতো কিছু পায়নি।

দীপকাকু বলে উঠলেন, "তার মানে যা দাঁড়াল, ডাকটিকিট-উৎসাহীরা আপনাকে বিরক্ত করে মারছে। দেখতে চাইছে উপন্যাসের সেই স্ট্যাম্পটা।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"আমার উপর যেটা চলছে, সেটাকে শুধু 'বিরক্ত' বললে অতিরিক্ত ভদ্রতা করা হবে। স্ট্যাম্প ডিলারের লোকজন ঘুরিয়ে প্রাণে মারার হুমকি দিচ্ছে আমাকে। ডাকটিকিটটা তাদের চাই-ই। আর স্ট্যাম্প কালেক্টাররা ফোন করে-করে জীবন অতিষ্ট করে তুলছে। ডাকটিকিটটাকে তারা একবার চাক্ষুস করতে চায়। আপনার আন্দাজমতো আমার বাড়িটা বেহালার ভিতর দিকে, বারিক পাড়ায়। পাশেই পুকুর, মাঠ। বেশ নির্জন জায়গায়। আমার তো এখন ভয় হচ্ছে, ওই স্ট্যাম্পটার লোভে বাড়িতে চোর-ডাকাত না পড়ে।"

"পড়লেও তাদের লাভ তো হবে না। স্ট্যাম্পটা তো সত্যি করে আপনার কাছে নেই," বললেন দীপকাকু।

"তা না থাকলে কী হবে, ওই উপলক্ষে আমার কালেকশনগুলো হাতিয়ে নেবে ওরা। যার মধ্যে বেশ কিছু স্ট্যাম্প যথেষ্ট মূল্যবান। এর পরও কিন্তু ওরা বিশ্বাস করবে না, উপন্যাসের স্ট্যাম্পটা আমার কাছে নেই। ভাববে, গোপন কোনও জায়গায় লুকিয়ে রেখেছি। আবারও বাড়িতে হানা দেবে। বিজনেসের কাজে অনেকটা সময় বাইরে থাকতে হয় আমাকে। বাড়িতে বুড়ো বাবা-মা, আমার স্ত্রী, চার বছরের ছেলে। উপন্যাসটা প্রকাশের পর থেকে ভীষণই নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছি।"

সুদর্শনকাকা দু'মগ চা নিয়ে ঢুকল। ঝিনুকের চায়ের নেশা নেই। চায়ের মগ নেওয়ার সময় সুদর্শনকাকাকে "থ্যাঙ্ক ইউ" বললেন উৎপল হাজরা।

কপাল কুঁচকে চায়ে চুমুক দিলেন দীপকাকু। জিজ্ঞেস করলেন, "উপন্যাসের রাইটারকে শনাক্ত করতে পারলেই কি আপনার এই সমস্ত প্রবলেম সল্ভ হয়ে যাবে? আপনি তো শুধু এই কাজটারই বরাত দিতে এসেছেন আমাকে। লেখককে খুঁজে দিলেই আর চোর-ডাকাত পড়বে না আপনার বাড়িতে? ফোনে বিরক্ত করবে না কেউ?"

পরপর দু'বার মগে চুমুক দিয়ে উৎপলবাবু বললেন, "হ্যাঁ, সমস্যা প্রায় অনেকটাই মিটে যাবে। কীভাবে যাবে, সেটা অবশ্য আপনাকে গুছিয়ে বলতে হবে। আপনি যদি আমাদের দুনিয়ার লোক হতেন, বলতে হত না। উপন্যাসটা প্রকাশ হওয়ায় সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে আমার ভাবমূর্তি। এই লাইনে সততার সুনাম একটা বড় ব্যাপার। ডাকটিকিট জমানো একটা নোবেল হবি। গায়ে একবার চোরের তকমা পড়ে গেলে এই দুনিয়ার মানুষ আমার সংগৃহীত সমস্ত স্ট্যাম্পকে সন্দেহের তালিকায় রাখবে। ধরে নেওয়া হবে, অসৎ উপায়ে জোগাড় করেছি। এগজিবিশনে পার্টিসিপেট করতে দেবে না। আমার স্ট্যাম্প নিলামে দাম পাবে না। অথচ স্ট্যাম্প ডিলার, কালেক্টার আমার সঙ্গে গোপনে যোগাযোগ করবে, এখন যেমন করছে। অত্যন্ত কম দাম দিয়ে কিনে নিতে চাইবে আমার মূল্যবান ডাকটিকিটগুলো। প্রকাশ্যে জানাবে না, স্ট্যাম্পগুলো কোথা থেকে সংগ্রহ করেছে। অর্থাৎ আমার এতদিনের নিষ্ঠা, শ্রমের মূল্য এখন তলানিতে," থামলেন উৎপল হাজরা।

চায়ে চুমুক দিয়ে ফের বলতে লাগলেন, "উপন্যাসটা পড়লে আপনি বুঝতে পারবেন, লেখকের ডাকটিকিট বিষয়ে ধারণা কতটা পরিষ্কার। আমি নিশ্চিত, লেখক আমার মতোই একজন সংগ্রাহক। ছদ্মনামের আড়ালে আছেন বলেই তাঁকে আমি চিনতে পারছি না। একবার যদি শনাক্ত করতে পারি, আমাদের ছোট্ট দুনিয়ার সকলকে জানিয়ে দেব, ওই মানুষটা আমার সঙ্গে শত্রুতা করছেন। আমি সত্যিই অপরাধী কি না, উনি প্রমাণ করুন। ছদ্মনামের আশ্রয়ে আমার বদনাম করছেন কেন?"

"এবার গোটাটাই ক্লিয়ার আমার কাছে। এখন উপন্যাসে লেখা স্ট্যাম্পটার বিষয়ে বলুন। কেন সেটা রেয়ার? সেই স্ট্যাম্প কি সত্যিই আপনার শিক্ষকতুল্য সংগ্রাহকের কাছে ছিল?"

ম্লান হাসলেন উৎপলবাবু। বললেন, "লেখকের মোক্ষম শয়তানিটা এইখানেই। ওই ডাকটিকিট পদ্মনাভবাবু, মানে শিক্ষকতুল্য সংগ্রাহকের কাছে ছিল না। তাঁর বাড়িতে আমার নিয়মিত যাতায়াত ছিল। তিনি নিজের সমস্ত সংগ্রহ আমাকে দেখিয়েছেন, আমিও আমার কালেকশন দেখিয়েছি।"

"পদ্মনাভ সমস্ত সংগ্রহ দেখিয়েছেন কী করে বুঝছেন? ওই স্ট্যাম্পটা তো সরিয়ে রাখতে পারেন।"

উত্তরে উৎপলবাবু বললেন, "এটা হচ্ছে আমাদের, মানে স্ট্যাম্প কালেক্টারদের সাইকোলজি। আমরা যদি কোনও দুষ্প্রাপ্য ডাকটিকিট সংগ্রহ করি, অবিলম্বে সেটা ডাকটিকিট-উৎসাহীদের দেখানোর জন্য অস্থির হয়ে পড়ি। দেখিয়ে সাফল্যের আনন্দ পাই। প্রাপ্তিটা শুনতে ছোট মনে হলেও, স্ট্যাম্প জমানোর ঝোঁক যাদের আছে, তাদের কাছে বিরাট পাওনা। ওই আনন্দ প্রাপ্তিটাই আমাদের স্ট্যাম্প সংগ্রহের জন্য তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়।

"যে স্ট্যাম্পের উল্লেখ উপন্যাসে আছে, তা এতটাই রেয়ার। কেউ যদি সংগ্রহ করতে পারি, রীতিমতো খাওয়াদাওয়ার আয়োজন করে ডাকটিকিট-উৎসাহীদের ডেকে স্ট্যাম্পটা দেখাব। পদ্মনাভবাবুর এত ঘনিষ্ঠ আমি, উনি সংগ্রহ করতে পারলে প্রথমে আমাকে ডেকে দেখাতেন।"

দীপকাকু মাথা উপর-নীচ করলেন। অর্থাৎ অনুধাবন করতে পারলেন ব্যাপারটা।

উৎপলবাবু ফের বলতে থাকলেন, "এবার কেন টিকিটটা রেয়ার বলি। এটা আমাদের দেশের গাঁধীজির ছবি দেওয়া সর্বপ্রথম ডাকটিকিট। প্রকাশিত হয় উনিশশো আটচল্লিশের পনেরোই অগস্ট। ভারতবর্ষের স্বাধীনতার প্রথম বর্ষপূর্তি, মহাত্মা গাঁধীর শোক স্মরণে। গাঁধীজি প্রয়াত হয়েছেন তার কয়েক মাস আগে। গাঁধীজির ছবি দিয়ে সেই সময় চারপ্রকার স্ট্যাম্প ছাপে ডাকবিভাগ।"

"এক-একটা ব্লকে চারটে চার রকম?" জিজ্ঞেস করলেন দীপকাকু।

প্রশ্নটা শুনে উৎসাহিত হলেন উৎপল হাজরা। বললেন, "ডাকটিকিটের ব্যাপারে আপনার তার মানে খানিকটা অবজারভেশন আছে দেখছি! আপনি ঠিকই বলেছেন, বিশেষ উপলক্ষে একসঙ্গে যখন কিছু ডাকটিকিট প্রকাশ হয়, সেটা একটা ব্লকে অথবা আনুভূমিক ভাবে পাশাপাশি থাকে। ধরা যাক, কোনও দেশ অলিম্পিক আয়োজনের দায়িত্ব পেয়েছে। সেই উপলক্ষে তারা ভিন্ন-ভিন্ন খেলার ছবি দিয়ে বেশ কিছু ডাকটিকিট প্রকাশ করল। চারটে ভিন্ন ইভেন্ট দিয়ে একটা ব্লক, কম-বেশি হলে সমান্তরাল ভাবে সাজানো থাকে। গাঁধীজির চারটে ছবির ক্ষেত্রে ব্লক তৈরি করা হয়নি। প্রতিটা ছবি পঞ্চাশটি করে একটি পাতা তৈরি হয়েছিল। চারটে চার রকম দাম, দেড় আনা, সাড়ে তিন আনা, বারো আনা আর দশ টাকা। দশ টাকা মানে তখনকার দিনে অনেক। তাই কম ছাপা হয়েছে। এইখান থেকেই এর দুষ্প্রাপ্যতা শুরু।

"এর মধ্যে বেশ কিছু স্ট্যাম্পকে সরকারি কাজে ব্যবহার করার জন্য 'সার্ভিস' কথাটা ছাপা হয়। সঙ্গে-সঙ্গে বিভিন্ন মহল থেকে সমালোচনার ঝড় ওঠে, গাঁধীজির মতো ব্যক্তিত্বের ছবির উপর ওরকম একটা কেজো কথা কালো অক্ষরে ছাপা হবে। এটা চলতে পারে না। সেই মহান আবেগকে শ্রদ্ধা করে সরকার 'সার্ভিস' লেখাওয়ালা স্ট্যাম্পগুলো বাতিল করে দেয়। ছাপা হওয়া এবং বাতিলের মাঝে কিছু স্ট্যাম্প খামে লাগিয়ে ব্যবহার করা হয়ে গিয়েছিল। তিন আনা, বারো আনার ক্ষেত্রে হয়নি। দেড় আনার বেশ কিছু স্ট্যাম্প এবং দশ টাকার মাত্র ছ'টা স্ট্যাম্প সরকারি কাজে ব্যবহার হয়," কিছু একটা মনে করে থামলেন উৎপল। বললেন, "এখানে একটা কথা বলে নেওয়া ভাল, ডাকটিকিট সংগ্রাহকদের কাছে ইউজড স্ট্যাম্প, মানে পোস্টঅফিসের ডাকমোহর লাগানো স্ট্যাম্পের গুরুত্ব অনেক বেশি। সেটা যদি খামসুদ্ধ পাওয়া যায়, তার চেয়ে ভাল কিছু আর হয় না। আমরা খামসমেত স্ট্যাম্পটাকে প্রিজার্ভ করি।"

"বুঝলাম। বাকিটা বলুন," বললেন দীপকাকু।

কিছুক্ষণ হল ঝিনুক ডায়েরিতে নোট নেওয়া শুরু করেছে। উৎপলবাবু এমন অজানা এতসব তথ্য দিচ্ছেন, পরে মনে রাখা দুষ্কর। বলতে শুরু করলেন উৎপল, "রেয়ার হচ্ছে দশ টাকার স্ট্যাম্পটা। একশোটার উপর 'সার্ভিস' কথাটা ছাপা হয়, ব্যবহার যেহেতু মাত্র ছ'টা হয়েছিল, ওটার একটাও যদি কারও সংগ্রহে থাকে, বিশ্বে স্ট্যাম্প

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কালেক্টারদের মধ্যে সে প্রথম সারির একজন। নিলামে খামসমেত স্ট্যাম্পটার দর কুড়ি থেকে পঁচিশ লাখ উঠে যাওয়াটা আশ্চর্যের নয়।"

"পঁচিশ লাখ!" বিপুল বিস্ময়ে বলে উঠলেন দীপকাকু।

ঝিনুকের পেন থেমে গিয়েছে। মুখ আক্ষরিক অর্থে হাঁ। উৎপল হাজরা বললেন, "তা হলেই ভাবুন, কিছু লোক যদি বিশ্বাস করতে শুরু করে অত দামি স্ট্যাম্পটা আমি হাতিয়েছি, কী পরিমাণ চাপ আমার উপর সৃষ্টি করবে তারা!"

দ্রুত নিজেকে ধাতস্থ করে নিলেন দীপকাকু। জিজ্ঞেস করলেন, "ছদ্মনামের আড়ালে থাকা লেখককে চিনতে এখন পর্যন্ত আপনি নিজের থেকে কী-কী চেষ্টা চালিয়েছেন?"

"খুব একটা কিছু করে উঠতে পারিনি। আপনি তো জানেন পুজোসংখ্যা 'অন্নপূর্ণা' কত বড় হাউজ থেকে বেরোয়। ওদের খবরের কাগজ, টিভিতে নিউজ় চ্যানেল, আরও কত ম্যাগাজ়িন! অন্নপূর্ণার পুজোসংখ্যার এডিটারের সঙ্গে দেখা করতে চাইলাম, পারমিশন পেলাম না। ফোনে অবশ্য কথা হল, পারমিতা গুপ্তর ফোন নাম্বার চেয়ে বললাম, ওঁর উপন্যাসটা ভীষণ ভাল লেগেছে আমার, নিজের মুখে ওঁকে সেটা জানাতে চাই। সম্পাদক বললেন, 'আপনার ভাল লাগাটা চিঠিতে লিখে আমাদের দফতরে পাঠিয়ে দিন, আমরা ওঁর কাছে পৌঁছে দেব। রাইটারের ফোন নম্বর, অ্যাড্রেস আমরা দিই না।' আমার আর কিছু করার রইল না। তার কিছুদিন পর হঠাৎ একদিন বিজ্ঞাপন বেরোয় অন্নপূর্ণার ডেলি নিউজপেপারে, 'ডাকমাশুল' উপন্যাসটা বই আকারে বের করছে এক প্রকাশন সংস্থা।"

ডাকমাশুল নামটা বেশ জব্বর লাগে ঝিনুকের কাছে। উৎপলবাবু বলতে থাকেন, "প্রকাশকের কাছে ছুটলাম। সেটিও নামী সংস্থা। আমার সঙ্গে ভদ্র ব্যবহারই করলেন। বললেন, লেখিকা এখনও তাঁদের হাউজে আসেননি। ফোনে বই করার সম্মতি জানিয়েছেন।"

দীপকাকু বলে ওঠেন, "ছদ্মনাম হোক অথবা না-হোক, রাইটার তার মানে মহিলা, ফোন নম্বরটা চেয়ে নিলেন না কেন?"

এখানেও ধোঁয়াশা। ফোন নম্বর চাইতে প্রকাশক বললেন, উপন্যাসটা ছাপতে ওঁরা প্রথমে অন্নপূর্ণার পুজোসংখ্যার এডিটরের সঙ্গে কথা বলেন। কারণ, রাইটার নতুন, কোনও কন্ট্যাক্ট নম্বর ওঁদের কাছে ছিল না। এডিটর প্রকাশককে বলেন, তাঁদের ইচ্ছের কথা লেখিকাকে জানিয়ে দেবেন। লেখিকা যদি মনে করেন, যোগাযোগ করে নেবেন প্রকাশকের সঙ্গে। ফোন করেছিলেন লেখিকা। প্রকাশক তাঁর নম্বরটা সেভ করতে ভুলে যান। লেখিকার মৌখিক সম্মতিতে কাগজে বইটার বিজ্ঞাপন দেন প্রকাশক। বইপ্রকাশের আগে লেখিকাকে একবার যেতেই হবে প্রকাশনার অফিসে, এগ্রিমেন্টে সই করতে। তখনই তাঁর নাম, ঠিকানা, ফোন নম্বর রেখে দেবেন প্রকাশক। কিন্তু লেখিকা যদি বলে রাখেন কন্ট্যাক্ট সোর্স বাইরের লোককে না দিতে, প্রকাশককে তাঁর কথা শুনতেই হবে। একমাত্র সরকারি কোনও এনকোয়ারি হলে আলাদা কথা।"

উৎপল হাজরার বলা শেষ হতে দীপকাকু শুধু হুম বলে গুম মেরে গেলেন। ঝিনুক বোঝার চেষ্টা করছে, উৎপল হাজরার সমস্যাটা আদৌ কতটা জটিল? দীপকাকুর সেলফোন বেজে উঠল। শার্টের পকেট থেকে মোবাইল সেট বের করলেন। স্ক্রিনে কলারের নাম দেখে চেয়ার ছেড়ে উঠে কেবিনের বাইরে চলে গেলেন।

একটানা কথা বলে উৎপল হাজরা একটু বুঝি ক্লান্ত। ঝিনুকের সঙ্গে চোখাচোখি হতে জিজ্ঞেস করলেন, "আমার প্রবলেমটা ঠিকঠাক গুছিয়ে বলতে পেরেছি তো?

"হ্যাঁ, পেরেছেন। ভালই পেরেছেন," ভদ্রতার হাসিসমেত উত্তর দিল ঝিনুক।

গলা নামিয়ে উৎপলবাবু জানতে চান, "আপনার কী মনে হয়, স্যার কেসটা নেবেন?"

একটু থমকায় ঝিনুক, কোন কেসটার প্রতি আকর্ষিত হবেন দীপকাকু আগাম আঁচ কোনওদিনই করতে পারে না সে। ফলে ঠোঁট উলটে উৎপলবাবুকে বলতেই হয়, "বলতে পারছি না।"

ফোনের কথা শেষ করে কেবিনে ফিরলেন দীপকাকু। উৎপলবাবুর উদ্দেশে বললেন, "আপনার কেসটা আমি নিচ্ছি। একটা ব্যাপার আমার কাছে ক্লিয়ার করুন তো।"

"বলুন কোন ব্যাপার? কেসটা হাতে নিলেন শুনে বেশ নিশ্চিত বোধ করছি। আমি শুনে এসেছি আপনি খুব বেছে কেস নেন।"

রিভলভিং চেয়ারে সামান্য দুলতে-দুলতে দীপকাকু বলতে থাকেন, "একটা স্ট্যাম্পের দাম যদি পঁচিশ লাখ পর্যন্ত উঠতে পারে, আপনার কাছেও তো বেশ কিছু রেয়ার কালেকশন আছে, হয়তো গাঁধীজির স্ট্যাম্পটার মতো অত রেয়ার নয়। তবু সব মিলিয়ে বেশ কয়েক লাখ টাকার সম্পত্তি। এ সবের লোভেও তো বাড়িতে চোর-ডাকাত পড়তে পারে। স্ট্যাম্পগুলোর কি ইনশিওরেন্স করানো আছে?"

"না, নেই। আমার চেনাজানা কোনও কালেক্টারই ইনশিওরেন্স করায়নি। তার কারণ, ইনশিওরেন্স কোম্পানির লোকেরা ডাকটিকিটগুলোর মূল্য নির্ধারণ করতে পারবে না। পারলে আমাদের মতো গুটিকতক কালেক্টার, ডিলাররাই পারবে। কোম্পানির লোক আমাদের কথা শুনবে কেন? মনে করবে আমাদের স্বার্থমতো দাম বলছি। এখানে একটা কথা আপনার মাথায় আসতে পারে, স্ট্যাম্প অ্যালবামগুলো আমরা ব্যাঙ্কের লকারে রাখি না কেন? সে ক্ষেত্রে সমস্যা হচ্ছে, ব্যাঙ্কের লোহার লকারগুলোর অ্যাটমোসফেয়ার অ্যালবাম রাখার পক্ষে উপযুক্ত নয়। ময়েশ্চার লেগে ডাকটিকিটগুলোর ক্ষতি হয়ে যাবে। স্ট্যাম্প অ্যালবাম রাখার সবচেয়ে আদর্শ জায়গা হল কাঠের বাক্স। আর আবহাওয়ায় হিউমিডিটি থাকলে, যেমন আমাদের শহরে আছে, স্ট্যাম্পের বাক্স যে ঘরে থাকবে, সেটায় এসি থাকা উচিত। এতদিন আমার এসি ছিল না। সদ্য লাগিয়েছি বেডরুমে। ওই ঘরের কাঠের আলমারিতে স্ট্যাম্পগুলো থাকে।"

"বাপরে, এত যত্ন করতে হয়।" বিস্ময়ের সঙ্গে বলে ওঠেন দীপকাকু।

"ঐতিহাসিক এবং আর্থিক মূল্যের নিরিখে এই যত্ন স্ট্যাম্পগুলোর প্রাপ্য। আমাদের সৌভাগ্য, সেই মূল্য সাধারণ চোর-ডাকাতদের কাছে অজানা। ফলে চুরির ভয় অতটা নেই। আমার কালেকশনে যা আছে, এই লাইনের কালেক্টারদের কাছে কম-বেশি তাই আছে। সার্ভিস লেখা গাঁধীজির ইউজড স্ট্যাম্পটা যদি আমার কাছে থাকত, মহার্ঘ হয়ে যেত আমার টোটাল কালেকশন। তখন চোর-ডাকাত পড়ার সম্ভাবনা থাকত। আমাদের দুনিয়ার লোকেরাই করাতে পারত। বাড়তি সতর্কতা নিতে হত আমাকে।"

কথা শেষ করে সাইডব্যাগটা কোলের উপর তুলে উৎপল হাজরা বের করলেন, পুজোসংখ্যা অন্নপূর্ণা। পত্রিকাটা দীপকাকুর দিকে বাড়িয়ে বললেন, "তদন্তে নামার আগে উপন্যাসটা পড়ে নিলে আপনার কাজের সুবিধে হবে।"

ম্যাগাজ়িনটা হাতে নিয়ে কভারে চোখ বোলালেন দীপকাকু। তারপর ঝিনুককে দিলেন। টেবিলে রাখা প্যাড-পেন উৎপলবাবুর দিকে এগিয়ে দিয়ে দীপকাকু বললেন, "আপনার বাড়ির ঠিকানা, পদ্মনাভবাবুর পুরো নাম, অ্যাড্রেস, ল্যান্ডলাইন নম্বর লিখে রেখে যান।"

নির্দেশমতো প্যাডে সমস্ত কিছু লিখতে থাকলেন উৎপল। লেখা শেষ করে দীপকাকুকে বললেন, "আপনাকে কিছু অ্যাডভান্স করি আমি? চেক বই নিয়ে এসেছি।"

"অ্যাডভান্স, ফিজ় এসব কথা পরে হবে। এমন হতেই পারে অন্নপূর্ণার এডিটর, রাইটারের আসল পরিচয় আপনাকে না দিলেও, আমাকে হয়তো দিয়ে দিলেন। তা হলেই তো আমার কাজ শেষ। এর কী ফিজ় নেব আমি?"

ঝিনুক একমনে প্রার্থনা করে দীপকাকু যে সম্ভাবনার কথা বলছেন, তা যেন সত্যি না হয়। অ্যাসিস্ট করার সুযোগ পরে আবার কোন কেসে আসবে, কতদিন প্রতীক্ষা করতে হবে, কে জানে!

উৎপল হাজরা চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়েছেন। দীপকাকুকে বললেন, "আমি কাল আপনাকে একটা ফোন করি?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"না, প্রথম ফোন আমি করব," বললেন দীপকাকু।

"আচ্ছা," বলে কেবিন থেকে বেরিয়ে গেলেন উৎপল হাজরা।

শেষ কথাটা দীপকাকু বেশ সিরিয়াস গলায় বলেছেন, মেজাজ বুঝতে ঝিনুক দীপকাকুর মুখের দিকে তাকায়, "ওমা, এরকম মিচকি-মিচকি হাসছেন কেন?"

দীপকাকু বলে উঠলেন, "লোকটা বেহালার ভিতর দিকে থাকে, কী করে বললাম বলো তো?"

দীপকাকু ইদানীং সুযোগ পেলেই ঝিনুকের বুদ্ধির টেস্ট নেন। উত্তরটা উৎপলবাবু উঠে যাওয়ার সময় পেয়েছে ঝিনুক। তাই বলতে পারে, "ভদ্রলোকের ট্রাউজারের লেফ্ট পোরশানে ভেজা মোরাম রাস্তার লাল ছিটে লেগে আছে। বাড়ি থেকে বেরিয়ে কাঁচা রাস্তায় অটোরিকশায় এসেছেন। অটোর সামনের সিটে একদম সাইডে বসার জায়গা পেয়েছেন।"

উজ্জ্বল হয়ে উঠল দীপকাকুর চোখ-মুখ। বললেন, "ভেরি গুড। ভালই প্রোগ্রেস হচ্ছে।"

॥ ২ ॥

ডাকমাশুল উপন্যাসটা এককথায় রোমহর্ষক। ঝিনুকের পড়া হয়ে গিয়েছে, বাবাও পড়েছেন। দীপকাকুই বলেছিলেন, দু'জনকে পড়ে নিতে। উৎপলবাবুর দিয়ে যাওয়া অন্নপূর্ণার পুজোসংখ্যাটা ঝিনুকের কাছেই রাখতে বলেছিলেন। নিজে একটা সংগ্রহ করে পড়ে নেবেন। পড়ে নিয়েওছেন। গতকালটা উপন্যাস পড়াতেই গেল। প্ল্যানটা দীপকাকুর, লেখাটা তিনজনে পড়ে নিয়ে আলোচনায় বসা হবে।

আলোচনার সময় স্থির হয়ে ছিল আজ সকাল ন'টায়, ঝিনুকদের বাড়িতে। উইথ গ্র্যান্ড ব্রেকফাস্ট। দীপকাকু মায়ের রান্নার ভূয়সী প্রশংসা করতে-করতে আলোচনা চালিয়ে গেলেন। প্রথমে উপন্যাস সম্বন্ধে বাবার মতামত চাইলেন।

বাবা বললেন, "উপন্যাসটা আমার খুবই ভাল লেগেছে। পুজোসংখ্যা অন্নপূর্ণায় প্রত্যেক বছরেই অন্য উপন্যাসের সঙ্গে একটা রহস্য উপন্যাস থাকে। আমি অবশ্যই পড়ি। এবার পড়া হয়ে ওঠেনি, এখন পড়ে দেখলাম, গত পাঁচ বছরের মধ্যে এটাই বেস্ট। যথেষ্ট পাকা হাতে লেখা।"

কথা কেটে দীপকাকু জিজ্ঞেস করেছিলেন, "লেখার ধরনটা কি আপনার চেনা ঠেকছে? আগে কখনও এঁর লেখা পড়েছেন?"

"পড়ে থাকতে পারি। কিন্তু লেখককে ঠিক প্লেস করতে পারছি না। তবে আমি একটা ব্যাপারে নিশ্চিত, ইনি মহিলা-লেখক। উপন্যাসে ঘর-গৃহস্থালীর এত নিপুণ বর্ণনা দিয়েছেন, কোনও পুরুষ লেখকের পক্ষে এতটা আয়ত্ত করা সম্ভব নয়। মহিলা চরিত্রগুলোও ফুটিয়ে তুলেছেন খুব সুন্দর ভাবে।"

বাবার কথায় দীপকাকুর সায় ছিল না। বলেছিলেন, "আপনার কথা মানতে পারলাম না রজতদা। আমাদের বাংলা ভাষায় অনেক গুণী পুরুষ-লেখক ছিলেন এবং আছেন, যাঁরা নিজেদের রচনায় ঘর-গৃহস্থালীর নিখুঁত বর্ণনা দিয়েছেন, নারী চরিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন সফল ভাবে। তাই লেখা পড়ে লেখকের জেন্ডার বোঝা কঠিন। আমার ধারণা, লেখাটা পড়াকালীন লেখকের মহিলা নামটা আপনার মাথায় থেকে গিয়েছিল। ওই নামটাই আপনাকে অলক্ষ্যে নির্দেশ করেছে উপন্যাসটা মহিলার বলে ধরে নিতে।"

তর্কে যাননি বাবা। দীপকাকু এর পর ঝিনুকের কাছে জানতে চাইলেন, "উপন্যাসটা পড়ে তোমার কী মনে হয়েছে বলো?"

ঝিনুক বলেছিল, "আমিও বাবার সঙ্গে একমত, উপন্যাসটা অত্যন্ত সুলিখিত। লেখক পুরুষ না মহিলা লেখা পড়ে বোঝার মতো ক্ষমতা আমার নেই। চেষ্টাও করিনি। এটুকু বুঝতে পেরেছি, লেখক খোদ কলকাতার মানুষ অথবা এই শহরের সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ রয়েছে, গলিখুঁজি পর্যন্ত চেনেন। উপন্যাসটা যে বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লেখা হয়েছে, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। 'সার্ভিস' লেখা গাঁধীজির দুর্মূল্য স্ট্যাম্প সত্যিই হয়তো পদ্মনাভবাবুর সংগ্রহ থেকে চুরি হয়েছে। চোরকে চিনিয়ে দেওয়ার জন্য লেখা হয়েছে নভেলটা। চুরির প্রমাণ যদি থাকত, দরকার পড়ত না কাহিনিটা লেখার।"

"উপন্যাস লিখে কি স্ট্যাম্পটা ফেরত পাওয়া যাবে? যাবে না। শুধুমাত্র বদনাম করা যাবে উৎপল হাজরার। লেখক যতই বিশ্বস্ত ভাবে চুরির ঘটনা লিখুন না কেন, আমাদের ধরেই নিতে হচ্ছে স্ট্যাম্প কালেক্টারদের সার্কিটে উৎপল হাজরার কৃতিত্বকে ধূলিসাৎ করার জন্যই লেখা হয়েছে নভেলটা।"

দীপকাকুর যুক্তিতে চুপ করে গিয়েছিল ঝিনুক। ভেবে রাখা পয়েন্টগুলো গুছিয়ে নিয়ে ফের বলতে শুরু করেছিল, "উপন্যাসে কে, কীভাবে চুরি করছে, চুরি করার সময় ধরা পড়ে গিয়ে মালিককে খুন করছে চোর, দু'জনের নাম-ঠিকানা বদলে সমস্ত ঘটনাই বলা হয়ে গিয়েছে। তারপরও কাহিনির শেষে দেখা যাচ্ছে সি আই ডি অফিসার তদন্তে নামছেন। তিনি বলছেন, চুরির প্ল্যান যেভাবে সাজানো হয়েছে, মার্ক হচ্ছে চোর, ঘটনাচক্রে যে এখন খুনি, তার কালেকশনে আরও কিছু পোস্টাল স্ট্যাম্প পাব। চোরের উদ্দেশে, আসলে এটা লেখকের থ্রেটনিং। লেখক ইঙ্গিত দিয়ে রাখলেন গাঁধীজির স্ট্যাম্পটা ভালয়-ভালয় ফেরত না পেলে আমি এই উপন্যাসের সেকেন্ড পার্ট লিখব। যেখানে উৎপলবাবুকে আরও অপদস্থ করা হবে। এই উপন্যাসের মাধ্যমে স্ট্যাম্পটা উদ্ধারের একটা প্রয়াস স্পষ্ট চোখে পড়ে। তার মানে স্ট্যাম্পটাও বাস্তবে আছে।"

"গুড অবজার্ভেশন!" প্রশংসা করার পর দীপকাকু পালটা যুক্তি দিয়ে বলেছিলেন, "তোমার কথা অনুযায়ী উপন্যাসটা লিখেছেন অথবা লিখিয়েছেন পদ্মনাভবাবুর উত্তরসূরি, সন্তান কিংবা কোনও প্রিয়জন, ওঁর সংগ্রহ যাঁর প্রাপ্য। তা সেই ব্যক্তি স্বনামে নভেলটা লিখলেন না কেন? উৎপলবাবু যদি ডাকটিকিটটা সত্যিই হাতিয়ে থাকেন, উপন্যাসটা পড়ে, ভয় পেয়ে ফেরত দেওয়ার ইচ্ছেও হয়, কাকে দেবেন? ছদ্মনামের আড়ালে থাকা লেখককে তো খুঁজে পাচ্ছেন না। ফেরত পাওয়ার বাসনা থাকলে লেখক এই হেঁয়ালিটা সামনে রাখবেন কেন? খুন তো সত্যিকারের হয়নি, ফেরত দিতে গিয়ে খুনি হিসেবে সাব্যস্ত হওয়ার ভয় নেই। আর ফেরত আড়াল থেকেও দেওয়া যায়, খামটা বড় এনভেলপে পুরে পোস্ট করে দিলেই হল।"

এর পর বাবা বলে ওঠেন, "আমি একটা জিনিস বুঝে উঠতে পারছি না, হাতে চুরির প্রমাণ নেই, তাই হয়তো মানহানির মামলা এড়াতে লেখক বাস্তব চরিত্রের নাম বদলেছেন, ঠিকানা প্রায় এক। লোকেশন বোঝা যাচ্ছে। তাতেই পারপাস সার্ভ হয়ে গিয়েছে লেখকের। তারপরও কেন ঘটনাটাকে খুন পর্যন্ত এগিয়ে নিয়ে গেলেন?"

দীপকাকু বললেন, "এর পিছনে দুটো কারণ থাকতে পারে, পদ্মনাভবাবুর মৃত্যুটা হয়তো স্বাভাবিক নয়, উপন্যাসের মতো ছুরি মেরে খুন না হলেও, হত্যা করা হয়েছে অন্য ভাবে। তদন্ত করে সেটা জানতে পারব। দ্বিতীয় সম্ভাবনাটা হচ্ছে, অপরাধীকে ধরিয়ে দেওয়ার জন্য একটা উপন্যাস লিখলাম, অন্নপূর্ণার মতো নামী পত্রিকা সেটা ছেপে দিল, তা তো হয় না। উপন্যাসটাকে একটা মানে পৌঁছতে হবে, জমজমাট, নাটকীয় হতে হবে, তবেই না মনোনয়ন পাবে। মনোনীত হওয়ার জন্যই খুনের ঘটনার অবতারণা।"

এত দূর বলার পর দীপকাকু চা খেতে-খেতে কী সব ভাবলেন। তারপর বলে উঠেছিলেন, "উপন্যাসের সবচেয়ে দুর্বল জায়গাটা দেখছি আপনাদের দু'জনেরই চোখ এড়িয়ে গিয়েছে। সম্ভবত উৎপলবাবুও খেয়াল করেননি। খেয়াল করা উচিত ছিল। ওঁর বিষয়ের এটা একটা টেকনিক্যাল ফল্ট। উপন্যাসে লেখা হয়েছে প্রভাকর চৌধুরী, বাস্তবে যিনি পদ্মনাভ নন্দী, সার্ভিস লেখা স্ট্যাম্পসমেত খামটা সংগ্রহ করেছিলেন জলপাইগুড়ির ডেড লেটার অফিস থেকে। প্রাপকের খোঁজ না পেয়ে ডাকবিভাগ যে-অফিসে আনডেলিভারড চিঠিগুলো জমা রাখে এবং একটা নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে সেগুলো নষ্ট করে দেয়, ওই অফিসের এক কর্মীই নাকি উপন্যাসের চরিত্র প্রভাকর চৌধুরীকে দুষ্প্রাপ্য ডাকটিকিটটি দেন। দিনপনেরো বাদেই তিনি খুন হন স্নেহধন্য পল্লব রায়ের হাতে। বাস্তবে যিনি উৎপল হাজরা। তখন পর্যন্ত একমাত্র পল্লব রায়কে তিনি দেখিয়ে ছিলেন সার্ভিস লেখা স্ট্যাম্পটা। এখানে প্রথমেই আপত্তিজনক ব্যাপারটা হচ্ছে, ডেড লেটার অফিসের কর্মী কোনও ভাবেই আনডেলিভারড একটি খাম বাইরের কাউকে দিতে পারে না। সম্পূর্ণ বেআইনি। যদি বেআইনি ভাবেই সংগ্রহ করা হয়, লেখকের সে কথা উল্লেখ করা উচিত ছিল। নাকি ব্যাপারটা নিয়ে তিনি ততটা ওয়াকিবহাল নন? এর পরে মেজর গন্ডগোলটা হচ্ছে 'সার্ভিস' ছাপ মারা ইউজড স্ট্যাম্পটা কিছুতেই ডেড লেটার অফিসে যাবে না। কারণ, ওটা সরকারি কাজে ব্যবহার করার জন্য ছাপা হয়েছিল। এক দফতরের আধিকারিকের কাছ থেকে অন্য দফতরের প্রধানের কাছে যাবে। সরকারি দফতর তো উঠে যাবে না, ঠিকানা ভুল হওয়ার চান্সও নেই। যদি ভুল হয়ও কিছু, যেখান থেকে পাঠানো হয়েছে চিঠি, সেখানেই ফেরত যাবে। ডেড লেটার অফিসে জমা হওয়ার কোনও প্রশ্নই নেই।"

ঝিনুক তো বটেই, বাবাও ভীষণ অবাক হয়েছিলেন দীপকাকুর পর্যবেক্ষণে। বলেছিলেন, "সত্যিই তো, এটা মস্ত ভুল। লেখকের লেখা পড়ে মনে হয়েছিল উনি ডাকটিকিট বিষয়ে প্রচুর জানেন। তিনি এরকম একটা সিলি মিসটেক করলেন কী করে? উৎপল হাজরাও ব্যাপারটা লক্ষ করলেন না কেন? শুধু এই পয়েন্টটা দেখিয়ে উপন্যাসটাকে আজগুবি বলে উড়িয়ে দেওয়া যায়। যারা তাঁকে বিরক্ত করছে, তাদের কাছে এই ভুলটা তিনি তুলে ধরুন।"

"হতে পারে উৎপল হাজরা সত্যিই ডাকটিকিটটা চুরি করেছেন। সেটা সামলাতে গিয়ে এতই টেন্‌স হয়ে পড়েছেন, ওই ত্রুটিটা খেয়াল হয়নি। তার সঙ্গে এটাও মনে হচ্ছে, লেখক ইচ্ছাকৃত ভুলটা করেছেন। তিনি প্রকাশ করতে চান না পদ্মনাভবাবু কোন রাস্তায় ডাকটিকিটটা সংগ্রহ করেছিলেন। সোর্সটা ওপেন করতে চাননি। ওই পথে আরও দুষ্প্রাপ্য ডাকটিকিট পাওয়ার সম্ভাবনা আছে তাঁর। আমরা তো ধরেই নিচ্ছি লেখক এই লাইনের লোক।"

দীপকাকুর বলা শেষ হতেই বাবা বলে উঠেছিলেন, "এই লাইনের লোক হয়েও লেখায় ও রকম একটা বোকার মতো ভুল করবে?"

"এই কথাটাই আমাকে ভাবাচ্ছে বেশি," বলে আলোচনা পর্ব শেষ করেছিলেন দীপকাকু। বাবার সঙ্গে দু'দান দাবা খেললেন মন দিয়ে। দু'বারই হারলেন বাবার কাছে। সচরাচর যেটা হয় না। মনটা চঞ্চল হয়ে আছে বোঝা গেল। তারপর ঝিনুককে বাইকে চাপিয়ে রওনা হলেন পদ্মনাভ নন্দীর বাড়ির উদ্দেশে।

দীপকাকু, ঝিনুক এখন পদ্মনাভ নন্দীর বাড়ির বসার ঘরে। উত্তর কলকাতায় গিরিশ অ্যাভিনিউয়ে দোতলা প্রাচীন বাড়ি। পুরনো বাড়িগুলো যেমন বড়সড় হয় তেমনই। দীপকাকু দেখা করতে এসেছেন পদ্মনাভবাবুর ছেলে অরিন্দম নন্দীর সঙ্গে। অ্যাপয়েন্টমেন্ট করেই এসেছেন। বাড়ির ঠিকানা, ফোন নম্বর উৎপলবাবুর থেকে নিয়ে রেখেছিলেন দীপকাকু। এখানে ফোন করার আগে উৎপলবাবুর থেকে জেনে নেন, বাড়ির মালিক এখন কে? তাতে জানা যায়, বছরছয়েক হল পদ্মনাভবাবুর স্ত্রী মারা গিয়েছেন। বাড়ির মালিক পুত্র অরিন্দম নন্দী, শ্যামবাজারে শাড়ির দোকান। কন্যা বিয়ের পর আমেরিকায়, হিউস্টনে।

অরিন্দম নন্দীকে নিজের ডিটেকটিভ পরিচয় দিয়েই ফোন করেছিলেন দীপকাকু। বলেছেন, "কোনও তদন্তের কারণে আপনার কাছে যাচ্ছি না। একটা কৌতূহল থেকে যাচ্ছি। গত পুজোসংখ্যা অন্নপূর্ণায় ডাকটিকিট নিয়ে একটা রহস্য উপন্যাস বেরিয়েছে, যার এক প্রধান চরিত্রের সঙ্গে আপনার বাবার সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। ডাকটিকিট বিষয়ে আমার খানিক আগ্রহ আছে। উপন্যাসটা পড়ে কিছু প্রশ্ন জেগেছে মনে। আপনাকে কি জিজ্ঞেস করতে পারি সে সব?"

অরিন্দমবাবু বলেছেন, "স্বচ্ছন্দে। যতটুকু জানি, উত্তর দিতে পারব। তবে প্রথমেই জানিয়ে রাখি, ডাকটিকিট বিষয়ে আমার নিজের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোনও জ্ঞান নেই। উৎসাহ নেই।"

অ্যাপয়েন্টমেন্ট ফিক্সড হয়েছিল দুপুর একটায়। অরিন্দমবাবু দোকান থেকে খেতে আসেন সেসময়। ঝিনুকরা সাড়ে বারোটা নাগাদ চলে এসেছে। তাই অপেক্ষা। দীপকাকু সারা ঘরে চোখ বুলিয়ে সেন্টার টেবিলে থাকা ম্যাগাজিনটা তুলে ওলটাচ্ছেন। ঘরে সাবেকি সব আসবাবপত্র। আলমারি ভর্তি বই। সমস্ত বই পদ্মনাভবাবুর সংগ্রহের। উৎপলবাবু মারফত দীপকাকু আজ জেনেছেন, পদ্মনাভবাবুর বই পড়ার আগ্রহ ছিল খুব। চাকরি অবশ্য করেছেন কারিগরি বিভাগে, খনিজ তেল কোম্পানির ইঞ্জিনিয়ার। প্রবাসে থেকেছেন দীর্ঘদিন। রিটায়ারমেন্টের পর কলকাতায়।

ঝিনুকদের দরজা খুলে দিয়েছিল মহিলা কাজের লোক। তাকে জানানো হয়েছে অরিন্দম নন্দীর সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্টের কথা। বসতে বলে খানিক পরে সেই মহিলাই দু'জনের জন্য চা-বিস্কুট দিয়ে গিয়েছে। তখন মহিলার পিছু-পিছু একটি ফুটফুটে, দুরন্ত বাচ্চা ঢুকে ছিল ঘরে। বছরছয়েক বয়স হয়তো হবে। ঝিনুকদের সঙ্গে ভাব জমাতে আসতে চাইছিল। কাজের মহিলা ওকে ধমক দিয়ে নিয়ে চলে গেল। এখন এই নিস্তব্ধ বাড়িতে মাঝে-মাঝে বাচ্চাটার গলার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে, আর পোষা টিয়াপাখির ডাক। টিয়াটা বিট্টু বা ওই জাতীয় কোনও শব্দকে সুর করে ডাকছে, 'বিট্টু, ও বিট্টু'। বাচ্চাটার নাম হবে হয়তো।

একটা বেজে দশ। প্রবল বোর হচ্ছে ঝিনুক। একটি মাত্র কারণে তার উৎসাহ পুরোপুরি উধাও হয়নি। এ বাড়িতে ঢোকার আগে দীপকাকু বলেছিলেন, "ছদ্মনামের লেখক এই অরিন্দম নন্দীরই হওয়ার চান্স সবচেয়ে বেশি।"

বাইরে গেট খোলার আওয়াজ পাওয়া গেল। আশা করা যায় অরিন্দম নন্দী এলেন। নড়েচড়ে বসে ঝিনুক। হ্যাঁ, তাই। সদরের পরদা সরিয়ে বছর পঁয়তাল্লিশের ভদ্রলোক দীপকাকুর উদ্দেশে হাতজোড় করে বললেন, "সরি, দেরি হয়ে গেল। ফোনে জানলাম আপনারা এসে পড়েছেন।"

"না, না। ইট্স ওকে। চা-টা খেলাম তো," বললেন দীপকাকু।

ভদ্রলোক এক আঙুল তুলে বললেন, "এক মিনিট। ভিতর থেকে একটু আসছি।"

এক মিনিটেরও কম সময়ে ফিরে এলেন অরিন্দম। হয়তো জানিয়ে এলেন, ফিরেছেন। কালো রঙের কাঠের সোফায় বসে অরিন্দম নন্দী দীপকাকুর উদ্দেশে বললেন, বলুন, "কী জানতে চান?"

"ডাকমাশুল নভেলটা কি আপনি পড়েছেন?" জিজ্ঞেস করলেন দীপকাকু।

ঝিনুক নিজের মোবাইল সেট রেকর্ডিং মোডে দিল। এ বাড়িতে প্যাড-পেন বের করতে বারণ করছেন দীপকাকু। বলেছেন, "আমরা ইনভেস্টিগেশনে এসেছি, যেন বুঝতে না পারে।"

দীপকাকুর প্রশ্নের উত্তরে অরিন্দমবাবু বলছেন, "পড়েছি। গল্প-উপন্যাস বড় একটা পড়া হয় না আমার। বিজনেসে বেজায় চাপ। কে একজন বলেছিল, আমার বাবাকে নিয়ে লেখা। তাই পড়েছি।"

"শুধু আপনার বাবা নন, আপনাদের এই বাড়ি, পরিবারের লোকজন, বাবার স্নেহধন্য উৎপল হাজরা..."

দীপকাকুর কথার মাঝে মিটিমিটি হাসতে লাগলেন অরিন্দম। থেমে গিয়ে দীপকাকু জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি হাসছেন কেন?"

হাসি চওড়া করে অরিন্দম বললেন, "উৎপল বেচারাকে গল্পে খুনি সাজিয়ে দিয়েছে। খুবই ভেঙে পড়েছে সে। ফোন করেছিল।"

"নভেলটা কেমন লেগেছে আপনার?" জানতে চাইলেন দীপকাকু।

"ভালই তো। বেশ জমজমাট।"

"লেখককে আপনি চেনেন?"

"না। ম্যাগাজিন থেকে নামটা জানলাম, পারমিতা গুপ্ত।"

"ওটা ছদ্মনাম।"

"হ্যাঁ, উৎপল বলেছিল বটে।"

"আপনার মনে হয় না, লেখক আপনাদের খুব পরিচিত কেউ। বসার ঘরটুকু দেখেই বুঝতে পারছি, এ বাড়ির ভিতরেও তিনি এসেছেন। তিনি কে, জানতে ইচ্ছে করেনি আপনার?"

অরিন্দমবাবু বললেন, "না, করেনি। আমার নেচারে বাড়তি কৌতূহল ব্যাপারটা একেবারেই নেই। উপন্যাসটা প্রকাশ হওয়ায় আমার এবং পরিবারের যখন কোনও ক্ষতি হচ্ছে না, লেখক কে, তা নিয়ে কেন মাথা ঘামাতে যাব আমি?"

একটু বুঝি দমে গেলেন দীপকাকু। কথা খুঁজে পাচ্ছেন না। অরিন্দমবাবুই বলে ওঠেন, "এই যেমন আপনি, ডাকটিকিটে আগ্রহ আছে বলে অ্যাপয়েন্টমেন্ট চেয়েছেন আমার। আমি কিন্তু বেশ বুঝতে পারছি, ইনভেস্টিগেশনে এসেছেন। ব্যবসা করে খাই, এটুকু বোঝার ক্ষমতা আমার আছে। আমি কখনও জানতে চাইব না, আপনার তদন্ত কী বিষয়ে? যতক্ষণ না বুঝব

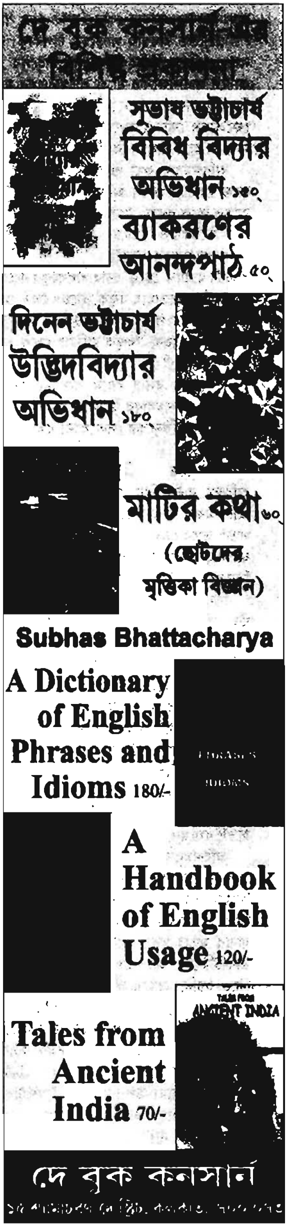

আপনার দ্বারা আমার কোনও ক্ষতি হতে পারে।"

অপ্রতিভ অবস্থায় পড়েছেন দীপকাকু। মুখ-চোখের অবস্থা ভাল নয়। এমনিতে নিরীহ ভালমানুষ টাইপের দেখতে। ভারী চশমাটার কারণে স্কুলশিক্ষকের মতো লাগে। এখন মনে হচ্ছে সেই চাকরিটাও গিয়েছে। পরাজয় মেনে নিয়ে দীপকাকু বললেন, "আপনি যখন ধরেই ফেলেছেন কোনও তদন্তে এসেছি, তা নিয়ে আপনি মোটেই ওরিড নন। তা হলে সামান্য কিছু হেল্প করুন।"

অরিন্দমবাবু কথা শুরু করতে যাবেন, ঘরে ছিটকে ঢুকল সেই দুরন্ত বাচ্চাটা। কোল আঁকড়ে ধরল অরিন্দমবাবুর। দীপকাকুর দিকে আঙুল তুলে বলল, "আঙ্কলটা কে বাবা?"

"ডিটেকটিভ। গোয়েন্দা-গোয়েন্দা।"

অরিন্দমবাবুর গলাটা ঝিনুকের কানে বিদ্রুপের মতো শোনাল। বাচ্চাটা বাবাকে ছেড়ে এবার দীপকাকুর কাছে চলে এল। বলল, "তুমি ডিটেকটিভ? তোমার বন্দুক আছে? দেখি-দেখি..."

দীপকাকুর প্যান্টের পকেটে প্রায় হাত ঢুকিয়ে ফেলেছে বাচ্চাটা। দীপকাকু বলছেন, "বন্দুক বাড়িতে রেখে এসেছি বাবা। দরকার হলে নিয়ে বেরোই।"

দীপকাকুর বলার ধরনে শাসানির সুর ঠেকল ঝিনুকের কানে। অবশ্যই অরিন্দমবাবুর উদ্দেশে। বাচ্চাটা ঝিনুকের কাছে চলে এল। খামচে ধরল ঝিনুকের সেলফোন। বলল, "মোবাইলটা দাও না, গেম খেলব।"

"কী হচ্ছে কী মিষ্টু। দিদি রেকর্ডিং করছে," ধমকে উঠলেন অরিন্দম নন্দী। ঝিনুকের অবস্থা খানিক আগের দীপকাকুর মতো। অরিন্দমবাবু বুঝে নিয়েছেন, ঝিনুক রেকর্ড করছে কথাবার্তা। যতটা সতর্ক ভাবে সেলফোনটা অপারেট করা উচিত ছিল, করেনি ঝিনুক। ধরা পড়ার লজ্জায় রেকর্ডিং অফ করল সে। অরিন্দমবাবু হাঁক দিলেন ভিতরবাড়ির উদ্দেশে, "সরলা, মিষ্টুটা জ্বালাচ্ছে। নিয়ে যাও।"

ঝিনুকের একটা আন্দাজ সঠিক, বাচ্চাটার নাম ধরেই ডাকছে টিয়াপাখিটা। নাম মিষ্টু, শুনতে লাগছে বিট্টু।

কাজের মহিলাটি এসে মিষ্টুকে প্রায় জোর করে নিয়ে গেল। বাচ্চাটা চলে যেতে দীপকাকু অত্যন্ত স্বাভাবিক কণ্ঠে বললেন, "আপনার কি এই একটিই সন্তান?"

"না, মেয়ে আছে। সে এখন স্কুলে। ক্লাস এইটে পড়ে।"

"ও আচ্ছা," বলে দীপকাকু প্রসঙ্গে ফিরলেন, "সার্ভিস লেখা গাঁধীজির স্ট্যাম্প উইথ এনভেলপ সত্যিই কি আপনার বাবার কালেকশনে ছিল?"

"না থাকারই কথা।"

"কেন এ কথা বলছেন? এবং বোঝা যাচ্ছে খুব একটা শিওর না হয়েই বলছেন," বললেন দীপকাকু।

অরিন্দমবাবু সপক্ষে বলতে লাগলেন, "বাবার কালেকশনে কী ছিল না-ছিল আমি ঘুরেও দেখতাম না। বাবা বেঁচে থাকতে বলে গিয়েছিলেন, কোর্ট পেপারে লিখেও দিয়েছেন, তাঁর ডাকটিকিটের সমস্ত সংগ্রহ কন্যা পাবে। অর্থাৎ আমার বোন, হিউস্টনে থাকে যে। বাবার মৃত্যুর খবর শুনে বোন সপরিবারে এসেছিল। আমি তাকে ডাকটিকিটের অ্যালবাম হ্যান্ডওভার করে দিই। ইনফ্যাক্ট আমাকে দিতে হয়নি, আমার স্ত্রী আর বোন আলমারি খুলে বের করেছে অ্যালবাম। মূল্যবান স্ট্যাম্পগুলোর একটা লিস্ট বাবা করে রেখেছিলেন। বোন লিস্টের সঙ্গে ডাকটিকিটগুলো মিলিয়ে দেখে নেয়। তারপর দামি, কমদামি সমস্ত স্ট্যাম্পই বিক্রি করে বাবার পরিচিত এক স্ট্যাম্প ডিলারের কাছে। টোটাল কালেকশন বিক্রি হয় দশ লাখ টাকায়। উপন্যাসে যে স্ট্যাম্পটার কথা বলা হয়েছে, দাম বিশ-পঁচিশ লাখ। এর থেকে প্রমাণ হয় বাবার সংগ্রহে ওই দুর্মূল্য স্ট্যাম্পটা ছিল না।"

"এই বাড়িটাতে বোনের কোনও ভাগ নেই?" জিজ্ঞেস করলেন দীপকাকু।

অরিন্দমবাবু বললেন, "না, নেই। বাবা বাড়িটা আমার নামে উইল করে দিয়ে গিয়েছেন। বিজনেসটা সম্পূর্ণ আমার। নিজের চেষ্টায় দাঁড় করিয়েছি।"

"বাবা গোটা বাড়িটা আপনার নামে করে দিলেন, অসন্তুষ্ট হননি আপনার বোন? কলকাতার যে জায়গায় আপনাদের এই বিশাল বাড়ি, মার্কেট প্রাইস অনুযায়ী পঞ্চাশ-ষাট লাখ দাম তো হবেই।"

দীপকাকুর বিস্ময়ের উত্তরে অরিন্দমবাবু বললেন, "বোন একেবারেই অসন্তুষ্ট হয়নি। আমেরিকায় ওর আর্থিক অবস্থা খুবই ভাল। পঁচিশ-তিরিশ লাখ টাকা ওর কাছে হাতের ময়লা। মানে, পেলে তো এ বাড়ির অর্ধেক পেত। আর আমি হাফ।"

"টাকার যখন প্রয়োজন নেই, কষ্ট করে সংগ্রহ করা বাবার ডাকটিকিটগুলো আপনার বোন বিক্রি করে দিলেন কেন? বাবার স্মৃতি হিসেবে রেখে দিতে পারতেন। অথবা কোনও ডাকটিকিটের মিউজিয়ামে দিয়ে রাখলে আপনার বাবার নামে সেগুলো প্রদর্শিত হত।"

"সত্যি কথা বলতে কী, আমার মতোই বোনেরও ডাকটিকিট নিয়ে কোনও ইন্টারেস্ট তৈরি হয়নি। বাবার তা নিয়ে একটু দুঃখও ছিল। বোনের নামে স্ট্যাম্পগুলো দিয়ে যাওয়ার কারণ, ওর যেহেতু টাকার দরকার নেই, বাবার কালেকশন বিক্রি করবে না। বিক্রি করলেও বোন সেই টাকা নিজের কাজে লাগাবে না, দান করে দেবে কোনও সেবা প্রতিষ্ঠানে। বেশ কিছু এন জিও-তে নিয়মিত সাহায্য করে সে।

অরিন্দমবাবুর কথা শুনে নিয়ে দীপকাকু বললেন, "এবার অন্য একটা প্রসঙ্গে যাই। আপনার বাবার মৃত্যুর ঘটনায় কোনও অস্বাভাবিকতা ছিল কি?"

"আপনি কি উপন্যাসে যে ঘটনা, মানে খুনের কথা বলছেন?"

"না, আমি জানি পদ্মনাভবাবু হার্ট অ্যাটাকে মারা যান। তার মধ্যে আনন্যাচারাল কিছু আপনার মনে হয়েছে কিনা, জানতে চাইছি।"

"না, সে রকম কোনও ধন্দ জাগেনি। বাবার হাই ব্লাড প্রেশার ছিল, ডায়াবেটিস ধরা পড়েছিল বছরদু'য়েক। এ ধরনের পেশেন্টের যেমনটা হওয়ার চান্স থাকে, তেমনটাই হয়েছে।"

"নিজের শরীরের যত্ন নিতেন? ওষুধবিষুধ খেতেন নিয়মিত?"

অরিন্দম বললেন, "একটু অবাধ্য ছিলেন। বয়সের সঙ্গে-সঙ্গে অবাধ্যতাও বাড়ছিল। বাবার শরীরের দিকটা আমার স্ত্রী খেয়াল রাখত। আমি বিশেষ নজর দিতে পারতাম না। তবে প্রতি সপ্তাহে প্রেশার চেকআপ, মাসে একবার সুগার টেস্টের ব্যবস্থা করে রেখেছিলাম। পাড়ার ওষুধের দোকানের একটা ছেলে এসে নিয়মিত চেকআপ, টেস্ট করে যেত।"

"যে সপ্তাহে উনি মারা যান, পরীক্ষাগুলো করা হয়েছিল?"

"প্রেশার তো চেক করেই ছিল নবারুণ, সুগার টেস্টের ডিউ ডেট সে মাসের ওই দিনেই ছিল। সুগার নর্মাল। প্রেশার একটু বেশি ছিল। তবে এমন নয় যে, তক্ষুনি ডাক্তার দেখাতে হবে। চারদিন বাদে ওই সপ্তাহতেই অ্যাটাক হল বাবার। হাসপাতাল নিয়ে যাওয়ার সময় পাওয়া যায়নি," থামলেন অরিন্দমবাবু। মৃত্যুর ঘটনাটা মনে করে একটু বুঝি বিমর্ষ।

সৌজন্যস্বরূপ সামান্য সময় নিয়ে দীপকাকু জিজ্ঞেস করলেন, "পদ্মনাভবাবু মারা গেলেন কোন সময়ে? তার আগে কি উৎপলবাবু দেখা করতে এসেছিলেন?"

ঝিনুক বুঝতে পারছে কোন সন্দেহ থেকে প্রশ্নটা করলেন দীপকাকু। হত্যাকারী হওয়ার সম্ভাবনা উৎপলবাবুর কতটা, দেখে নিচ্ছেন। অরিন্দমবাবু বললেন, "হ্যাঁ, সেদিন সকালে উৎপলের সঙ্গে অনেকক্ষণ গল্প করেছিলেন বাবা। দুপুরে বাথরুমে স্নান করতে গিয়ে এই ঘটনা।"

"আপনি কি তখন বাড়িতে?"

"না, দোকানে। বাড়ি থেকে ফোন যেতেই দৌড়ে চলে আসি।"

অরিন্দমবাবুর কথা শুনে মাথা নিচু করে বসে রইলেন দীপকাকু। ভাবনা চলছে মাথায়। মুখ তুলে বিনয়ের সঙ্গে বললেন, "আপনার বাবার বেডরুমটা কি একবার দেখতে পারি। খুব সম্ভব সেটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দোতলায়। উপন্যাসে তেমনই লেখা হয়েছে।"

"খুনের ঘর দেখতে চাইছেন?" নির্লিপ্ত কণ্ঠে খোঁচাটা মারলেন অরিন্দমবাবু।

দীপকাকু হজম করলেন বিদ্রুপটা। প্রত্যুত্তরে গেলেন না। অরিন্দম নন্দী সোফা ছেড়ে উঠে পড়েছেন। বললেন, "আসুন।"

ঝিনুকরা দোতলায় পদ্মনাভবাবুর শোবার ঘরে চলে এসেছে। বেশ বড় ঘর, প্রাচীন ভারী আসবাব। বিছানাটা খাট নয়, পালঙ্ক। দেওয়ালে ঝুলছে ফ্রেমে বাঁধানো পদ্মনাভবাবুর বড় ছবি। টাটকা মালা ঝুলছে তাতে। পদ্মনাভবাবুর স্মৃতি যত্নে আগলে রেখেছেন এঁরা। রাখারই কথা, মাসচারেক হল প্রয়াত হয়েছেন তিনি।

ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে চারপাশে চোখ বোলাচ্ছেন দীপকাকু। দুটো বড় জানলার একটায় দৃষ্টি স্থির হল। অরিন্দমবাবুর উদ্দেশে বলে উঠলেন, "জানলার বাইরে ওই ত্রিফলা বাতিটা কতদিন হল লাগিয়েছে কর্পোরেশন?"

"প্রথম থেকেই। মানে, যবে থেকে এই বাতি লাগানো শুরু হল কলকাতায়। বাবা মজা করে বলতেন, সরকার অজান্তেই ওঁকে একটা গিফ্‌ট দিয়ে ফেলেছে। ওই বাতির আলো পুরো ঘরটাকেই আলোকিত করে। লেখাপড়ার কাজ থাকলেই শুধু এ ঘরের আলো জ্বালাতে হয়।"

টিয়াটা এখনও মিষ্টুর নাম ধরে ডেকে যাচ্ছে। আওয়াজের জোর শুনে বোঝা যাচ্ছে, দোতলার বারান্দাতেই ঝোলানো আছে খাঁচা। দীপকাকুর পরের প্রশ্নে কান দেয় ঝিনুক। বলছেন, "শেষদিন পদ্মনাভবাবু কি এই ঘরে বসে উৎপলবাবুর সঙ্গে আড্ডা দিয়েছিলেন?"

"হ্যাঁ, তবে বাবা সহজে বাইরের লোককে এ ঘরে এন্ট্রি দিতেন না। উৎপলকে খুবই আপনজন মনে করতেন। ডেকে নিতেন দোতলায়। তারপর এখানে বসে ঘণ্টার পর-ঘণ্টা আড্ডা। বিষয় কিন্তু ওই একটাই, ডাকটিকিট।"

মিষ্টু লাফিয়ে ঢুকল ঘরে। দৌড়ে গিয়ে অরিন্দমবাবুর হাত ধরল। বলল, "বাবা, আমার খাওয়া হয়ে গিয়েছে।"

"ভেরি গুড।" বললেন অরিন্দমবাবু।

মিষ্টু বলল, "তোমরা কখন খাবে?"

"এই তো, এবার খাব," বললেন অরিন্দম।

মিষ্টু ধরে নিয়েছে ঝিনুকরাও এবাড়িতে দুপুরে খাবে। ঝিনুক মিষ্টুকে কাছে টেনে নেয়। বলে, "পাখিটা তোমায় খুব ভালবাসে দেখছি। খালি নাম ধরে ডাকছে।"

"দাদুর কাছ থেকে শিখেছে," বলল মিষ্টু।

দীপকাকু হঠাৎ মিষ্টুর দিকে ঘুরে গিয়ে বললেন, "তুমিও কি দাদুর মতো স্ট্যাম্প জমাও? অ্যালবাম আছে তোমার?"

"আছে তো। দেখবে তোমরা?" বলে ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল মিষ্টু।

অরিন্দমবাবু অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন দীপকাকুর দিকে। এতক্ষণ যে স্মার্ট ভাবটা মেনটেন করছিলেন, সেটা আপাতত উধাও। বললেন, "আপনি কী করে আন্দাজ করলেন মিষ্টুর অ্যালবাম আছে? যদিও এটা ওর কাছে নিছকই খেলা।"

"দাদুর সঙ্গে সম্পর্কটা দেখলাম বেশ মধুর। পাখির ডাকটায় এখনও দাদুকে খুঁজে পায়। দাদুর শখে ও যে প্রভাবিত হবে, এমনটাই তো স্বাভাবিক।"

দীপকাকুর কথা শেষ হতেই স্ট্যাম্প অ্যালবাম নিয়ে ঘরে ঢুকল মিষ্টু। আসলে ফোটো অ্যালবাম। কালো রঙের প্লাস্টিক পেজ, ট্রান্সপারেন্ট জ্যাকেটে স্ট্যাম্প ঢোকানো। দ্রুত অ্যালবামের পাতায় চোখ বুলিয়ে দীপকাকু বললেন, "দারুণ কালেকশন! খুব ভাল।"

দীপকাকু অ্যালবাম পাস করলেন ঝিনুককে। পাতা ওলটাতে যাবে ঝিনুক, মিষ্টু হাত ধরে টেনে নিজের হাইটে নিয়ে এল। অর্থাৎ ঝিনুক নিলডাউন। দীপকাকু অরিন্দমবাবুকে বললেন, "বাড়ির ফোনটা কি দোতলাতেই থাকে, পাশের ঘরে?"

"না, উপন্যাসে ওটা বানানো হয়েছে। ল্যান্ডফোন নীচে, আমার ঘরে।"

"দোতলার বাথরুমটা কোথায়? ওখানেই অ্যাটাকটা হয়েছিল তো আপনার বাবার?"

"ঠিক তাই। আসুন দেখাচ্ছি।"

অরিন্দমবাবুর পিছন-পিছন বেরিয়ে গেলেন দীপকাকু। ঝিনুকের যাওয়ার উপায় নেই। মিষ্টু নিজের অ্যালবামের স্ট্যাম্পগুলো দেখিয়ে নানান কথা বলে যাচ্ছে। কোনটা কীভাবে জোগাড় করেছে। দাদু কোনটা দিয়েছে। পাবে না জেনেও ঝিনুক মিষ্টুর অ্যালবামে খুঁজে যাচ্ছে সার্ভিস ছাপ মারা গাঁধীজির স্ট্যাম্প। গাঁধীজির কোনও স্ট্যাম্পই এই অ্যালবামে নেই।

দীপকাকু দোতলার ঘরে ওঠার পর থেকে উপন্যাসের সঙ্গে বাস্তবকে মেলানোর চেষ্টা করে যাচ্ছেন। ল্যান্ডফোনের অবস্থান জানলেন সেই কারণেই। উপন্যাসে ছিল বৃদ্ধ সংগ্রাহক অ্যালবাম খুলে সার্ভিস লেখা গাঁধীজির স্ট্যাম্পটা তাঁর স্নেহধন্যকে দেখিয়ে পাতা উলটেছেন, পাশের ঘরে ল্যান্ডফোন বেজে উঠল। অ্যালবাম পালঙ্কের উপর রেখে ফোন ধরতে গেলেন উপন্যাসের চরিত্র প্রভাকর চৌধুরী। ঘর থেকে বেরিয়েই তাঁর মনে পড়ল ইংরেজি একটি নভেলের গল্প, পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার দুষ্প্রাপ্য ডাকটিকিট ইনভার্টেড সোয়ান, ছাপার ভুলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাজহাঁস ওলটানো অবস্থায়, চুরি হয়েছিল এই ধরনের প্ল্যানে। সে ক্ষেত্রে ফোন আসেনি, চোরের ছেলে ডোরবেল বাজিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল। প্রভাকর চৌধুরীর মনে হল গাঁধীজির দুর্মূল্য স্ট্যাম্পটা পল্লব রায়ের কাছে ছেড়ে যাওয়া উচিত ছিল না। ফোন না ধরে ঘরে ফিরে আসেন তিনি, সন্দেহ একেবারে পাকা, পল্লব রায় 'সার্ভিস' লেখা গাঁধীজির স্ট্যাম্পসুদ্ধ খামটা [illegible] পল্লব রায়ের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন প্রভাকর। হুমকি দিলেন পল্লবকে পুলিশে দেবেন বলে। পল্লব নিজেকে বাঁচাতে, একইসঙ্গে স্ট্যাম্পটা হাতাতে দৃঢ়সংকল্প। ছুরি দিয়ে খুন করে শিক্ষকতুল্য প্রভাকর চৌধুরীকে। ল্যান্ডফোনে কলটা পল্লব রায়ই করেছিল, প্রভাকর চৌধুরীর অলক্ষ্যে, স্ট্যাম্প অ্যালবাম দেখতে-দেখতে। ফোন নম্বরটা আগেই রেডি রেখেছিল মোবাইলে, সুইচটা শুধু টিপে দেয়। উপন্যাসে ঘটনাটা ঘটেছিল সন্ধেবেলায়। বাস্তবে পদ্মনাভবাবু মারা যান দুপুরবেলা, বাথরুমে হার্ট অ্যাটাক হয়ে। উৎপল হাজরা চলে যাওয়ার পর। বাস্তবের সঙ্গে উপন্যাসের বিস্তর অমিল। গাঁধীজির দুর্মূল্য স্ট্যাম্প যে পদ্মনাভবাবুর কাছে ছিল, এমন কোনও প্রমাণও এখন পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। তাও কেন দীপকাকু এত খুঁটিয়ে সব কিছু দেখছেন?

দরজার গোড়ায় চলে এসেছেন দীপকাকু, অরিন্দম নন্দী। দীপকাকু অরিন্দমবাবুকে বলছেন, "আপনাকে কী বলে যে ধন্যবাদ জানাব! এতক্ষণ সময় দিলেন, এবার লাস্ট রিকোয়েস্ট, আপনার বোনের ইমেল আইডিটা যদি দেন, প্রয়োজনে যোগাযোগ করতে পারি।"

"সরি, আপনার এই অনুরোধটা রাখতে পারছি না। ডিটেকটিভের সঙ্গে কথা বলতে আমার কোনও সমস্যা বা অস্বস্তি না থাকতে পারে, বোনের থাকতেই পারে। তাই বোনকে জিজ্ঞেস না করে ওর ইমেল আইডি আপনাকে দিতে পারি না।"

দীপকাকু বললেন, "ঠিক আছে, জিজ্ঞেস করেই দেবেন। কাল আপনাকে ফোন করে জেনে নেব। আপনার মোবাইল নাম্বারটা প্লিজ বলুন। আমি মিস্‌ড কল দিচ্ছি। আমার নাম্বারটা সেভ করে রেখে দিন।"

ফোন নম্বর দেওয়া-নেওয়া হল। দীপকাকু ঝিনুক এখন অরিন্দম নন্দীর বাড়ির বাইরে। বাইকের দিকে হেঁটে যেতে-যেতে দীপকাকু বললেন, "ভদ্রলোককে কেমন বুঝলে?"

"বেশ ধুরন্ধর প্রকৃতির," বলল ঝিনুক।

"আর ওঁর ছেলেটা?"

ঝিনুক তো অবাক। ওইটুকু বাচ্চা ছেলেকে আবার বোঝার কী আছে।

বাইকে খানিকটা যেতে না-যেতেই রাস্তার ধার ঘেঁষে দাঁড় করালেন দীপকাকু। লাগোয়া একটা মেডিকেল স্টোর। বাইক থেকে নেমে দীপকাকু এগিয়ে যাচ্ছেন দোকানের দিকে। হঠাৎ ওষুধের দরকার পড়ল কেন?

দোকানের কাউন্টারে পৌঁছে ব্যাপারটা ক্লিয়ার হল। দীপকাকু এক সেল্‌সম্যানকে বললেন, "নবারুণ এখানে কাজ করেন?"

"আমিই নবারুণ। কেন বলুন তো?" বললেন বছর আঠাশ-তিরিশের লোকটি।

দীপকাকু নিজের ভিজিটিং কার্ড বাড়িয়ে দিলেন তাঁর দিকে। বললেন, "কাইন্ডলি যদি একটু বাইরে আসেন, দু'-একটা কথা জানার আছে।"

কার্ডে দীপকাকুর ডিটেকটিভ পরিচয় পেয়ে নবারুণবাবুর বেশ থতমত অবস্থা। ইনিই পদ্মনাভবাবুর প্রেশার, সুগার চেক করতেন নিয়মিত। অরিন্দমবাবুর কাছ থেকে খানিক আগে জেনেছে ঝিনুকরা।

কাউন্টার থেকে অনেকটাই পিছিয়ে এসেছেন দীপকাকু। সামনে এসে দাঁড়ালেন নবারুণ। নার্ভাস গলায় জানতে চাইলেন, "কী ব্যাপার বলুন তো?"

"আপনাদের পাড়ার পদ্মনাভ নন্দীর ব্লাডপ্রেশার, সুগার আপনিই তো চেক করতেন?" বললেন দীপকাকু।

"হ্যাঁ, আমিই করতাম।"

"লাস্ট যে বার চেক করেছিলেন, প্রেশার কি খুব হাই ছিল? ডাক্তার দেখানোর মতো?"

"খুবই হাই ছিল। যন্ত্রে গোলমাল আছে কিনা বুঝতে আমি দু'বার চেক করি। একই রেজাল্ট পেলাম। বউদি, মানে অরিন্দমদার বউকে বলেছিলাম একবার ডাক্তারের সঙ্গে কনসাল্ট করে নিতে। যত দূর জানি, ডাক্তার দেখাননি ওঁরা। ওই সপ্তাহেই মারা গেলেন জেঠু।"

অরিন্দমবাবুর সঙ্গে নবারুণের কথা মিলছে না। অরিন্দম দীপকাকুকে বলেছেন, "ব্লাডপ্রেশার ডাক্তার দেখানোর মতো বাড়াবাড়ি ছিল না।" দীপকাকুর বোধ হয় তখনই সন্দেহ হয়েছিল। ওঁদের বাড়ি থেকে বেরিয়েই ক্রস চেক করে নিলেন। ফের জিজ্ঞেস করছেন, "পদ্মনাভবাবুর ব্লাডপ্রেশার হঠাৎ বাড়ল কেন? শুনলাম নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করাতেন, ওষুধ খেতেন। অন্য কোনও রোগের উপসর্গ কি এটা? ডাক্তার না হলেও আপনি তো এই লাইনে আছেন, কারণ কিছু আন্দাজ করতে পারেন?"

"অন্য কোনও রোগ নয়, স্রেফ টেনশন থেকে হয়েছে এটা।"

"কী রকম? কিসের টেনশন?" জানতে চাইলেন দীপকাকু।

নবারুণ বলছেন, "বাড়িটা নিয়ে টেনশন। জেঠুর ইচ্ছে ছিল বাড়িটা ছেলেমেয়ে দু'জনের নামে করে দিয়ে যাওয়ার। অরিন্দমদা করতে দেবে না। বাড়ি তার একার চাই। মহুয়াদি, মানে জেঠুর মেয়ে, অত বড়লোক। আমেরিকায় সেটল্‌ড, সে-ও ছাড়বে না তার অধিকার। ও দেশ থেকে ঘন-ঘন ফোন করত বাবাকে। দু' কথায় শরীর-স্বাস্থ্যের খবর নিয়ে বাড়ির কথা তুলত। বলত, তুমি দাদাকে দোকানটা করে দিয়েছ, বাড়িটাও দেবে, তা কী করে হয়! এটা তো আমার প্রতি অন্যায় হচ্ছে।"

আবারও নবারুণবাবুর সঙ্গে অরিন্দমবাবুর কথা মিলছে না। অরিন্দম বলেছিলেন, বাড়িটা বাবা তাঁর নামে করে দেওয়ায় বোন এতটুকু অসন্তুষ্ট হয়নি।

মানুষটার তো মিথ্যে বলতে গলা কাঁপে না দেখা যাচ্ছে! ঝিনুক দীপকাকুর পরের প্রশ্নে কান দেয়। উনি জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি ওঁদের বাড়ির ভিতরের কথা এত জানলেন কীভাবে?"

"জেঠুই বলতেন। নিজের লোক ভাবতেন আমাকে। প্রেশার মাপতে যাওয়ার কারণে সপ্তাহে একদিন দেখা তো হতই।"

নবারুণবাবুর বলা শেষ হতেই দীপকাকু হাত বাড়িয়ে হ্যান্ডশেক করলেন। বললেন, "ইনফরমেশনগুলো দেওয়ার জন্য থ্যাঙ্কস আপনাকে, চলি।"

"গড়বড়টা কী, কেসটা কী নিয়ে, বলা যাবে কি?"

দীপকাকু ঘুরে গিয়ে হাঁটতে শুরু করেছিলেন। নবারুণবাবুর প্রশ্ন শুনে ঘাড় ফিরিয়ে বললেন, "এখনই বলা যাবে না। আপনিও কাউকে বলবেন না আমার আপনার দেখা হওয়াটা।"

বাধ্য ছাত্রের মতো ঘাড় হেলালেন নবারুণ। ঘাবড়ানো ভাবটা এখনও চেহারায় লেগে আছে।

বাইকে উঠে দীপকাকু বলেছিলেন, "আজকের মতো ফিল্ডওয়ার্ক শেষ।" কিন্তু বাইক জোড়াসাঁকোর কাছাকাছি পৌঁছতেই মালুম হল কাজ এখনও শেষ হয়নি। গাড়ি চালু অবস্থায় দীপকাকু বললেন, "লুকিং গ্লাসটা দেখো। একজন আমাদের অনেকক্ষণ ধরে ফলো করছে। চেক-শার্ট। ড্রাইভ করছি বলে বাইকের নম্বরটা পড়তে পারছি না। তুমি ট্রাই করো পড়ার।"

লুকিং গ্লাস থেকে চেকশার্ট বাইক আরোহীকে শনাক্ত করল ঝিনুক। অনেকটা ডিসট্যান্স রেখে ফলো করছে। মাথায় হেলমেট। ফলে মুখ দেখার উপায় নেই। পিছনে ঘাড় ফিরিয়ে বাইকের নম্বরটা পড়ার চেষ্টা করে ঝিনুক, পারে না। দীপকাকুকে বলল, "পড়া যাচ্ছে না নম্বর। গাড়ি না থামা পর্যন্ত পড়া যাবে না।"

"সামনে ক্রসিং। সিগনাল না পেয়ে যদি দাঁড়াতে হয়, তুমি বাইক থেকে নেমে যাবে। ওকে বুঝতে না দিয়ে ওর বাইকের দিকে এগোবে। পড়ে আসবে নম্বর। ক্রসিং পার করে আমি ফুটপাতের ধারে দাঁড়াব,"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বললেন দীপকাকু।

সিগন্যাল পাওয়া গেল না। দীপকাকু বাইক দাঁড় করিয়েছেন। ঝিনুক নেমে গিয়ে এমন ভঙ্গিতে পিছন দিকে হাঁটতে লাগল, যেন এখানেই তার নামার কথা। কিছু দূর হেঁটে গিয়ে চেকশার্ট অনুসরণকারীর দিকে আড়চোখে একবার তাকায় ঝিনুক, এ কী লোকটা ইউ টার্ন নেওয়ার চেষ্টা করছে। ব্যাক করতে ইশারা করছে পিছনের চার চাকাকে। বুঝে গিয়েছে ঝিনুকের প্ল্যান। সামনে অসংখ্য গাড়ির কারণে চেকশার্টের বাইকের নম্বরটা আড়াল হয়ে আছে। দাঁড়িয়ে থাকা গাড়িগুলোকে পাশ কাটিয়ে ঝিনুক এঁকেবেঁকে দ্রুত এগোতে থাকে চেকশার্টের বাইক লক্ষ করে। কিন্তু কাছাকাছি পৌঁছনোর আগেই ইউ টার্ন নেওয়ার স্পেস পেয়ে যায় বাইকটা। পাশের লেন ধরে ঝড়ের বেগে ফিরে যায়। নম্বর পড়তে পারে না ঝিনুক।

॥ ৩ ॥

পরের দিন দুপুর এগারোটা। ঝিনুক দীপকাকুর সঙ্গে বসে আছে অন্নপূর্ণা পত্রিকা অফিসের রিসেপশনে। প্রায় আধঘণ্টার উপর হয়ে গেল এসেছে ঝিনুকরা। দীপকাকু নিজের কার্ড রিসেপশনে দিয়েছেন এখানে ঢুকেই। বলেছেন, "মিস্টার পার্থ রায়ের সঙ্গে দেখা করতে চাই।"

মহিলা রিসেপশনিস্ট ঝিনুকদের বসতে বলে পাশে দাঁড়িয়ে থাকা অ্যাটেনডেন্টকে দিয়ে দীপকাকু কার্ড পাঠালেন উপরে। এখনও পর্যন্ত তার জবাব এল না।

পার্থ রায় অন্নপূর্ণা পুজোসংখ্যার সম্পাদক। দৈনিক খবরের কাগজ অন্নপূর্ণার সহযোগী সম্পাদক। দীপকাকু ওঁর কাছে এসেছেন পারমিতা গুপ্তর আসল পরিচয় জানতে। ফোন করেও জিজ্ঞেস করা যেত, সেক্ষেত্রে উৎপল হাজরা যে জবাব পেয়েছেন, দীপকাকুও হয়তো তাই পেতেন। সেই কারণেই সরাসরি অফিসে চলে আসা, কার্ডটা দেখিয়ে কথা বলতে চাওয়া। কার্ডে লেখা গোয়েন্দা পরিচয়টা নিশ্চয়ই গুরুত্ব বহন করবে।

কোথায় গুরুত্ব? সেই থেকে তো বসেই আছে ঝিনুকরা। আদৌ ডাকবে কি? অথচ এই সংস্থা প্রত্যেক পুজোসংখ্যায় একটা করে রহস্য উপন্যাস ছাপে। সেখানে ডিটেকটিভ চরিত্রটিকে কত গৌরবান্বিত করা হয়, প্রাধান্য দেওয়া হয়। আর আসল গোয়েন্দা দীপকাকুকে বসিয়ে রাখা হয়েছে কেমন অবহেলায়! তা নিয়ে দীপকাকুর কোনও ভ্রুক্ষেপ নেই। ডানদিকের দেওয়ালে টিভির জায়ান্ট স্ক্রিনে এই সংস্থার নিউজ চ্যানেলের প্রোগ্রাম দেখে যাচ্ছেন।

উৎপল হাজরার কেসটা এমন টার্ন নেবে, বাবা বুঝতে পারেননি। এখানে আসার জন্য দীপকাকু আজ যখন ঝিনুককে নিতে এসেছিলেন বাড়িতে, বাবা বললেন, "কী ব্যাপার দীপঙ্কর, একটা নিরীহ কেস, ছদ্মনামের লেখকের আসল পরিচয় জানা। সেখানে তোমাদের ফলো করার ঘটনা আসছে কেন?"

মায়ের জোরাজুরিতে দীপকাকু চা, হাতে বানানো স্ন্যাক্স খেতে-খেতে বাবার কথার উত্তরটা দিলেন। বললেন, "কেসটা হাতে নেওয়ার সময় আমার মনে হয়েছিল, যতটা সিম্পল লাগছে শুনতে, আসলে তা নয়। একজনকে বদনাম করার জন্য এত বড় আয়োজন! বহুল প্রচারিত পত্রিকায় ছদ্মনামে উপন্যাস লেখার দরকার পড়ছে কেন? কালেক্টারদের দুনিয়া অত্যন্ত ছোট। উৎপলবাবুর শত্রু ওই সার্কিটে অন্য কোনও গুজব ছড়িয়ে বদনামের চেষ্টা করতে পারত। তাতেই তার উদ্দেশ্যসাধন হত। পদ্মনাভবাবুর মৃত্যু পর্যন্ত অপেক্ষা করল কেন? এর থেকেই আমার মনে হতে শুরু করে পদ্মনাভবাবুর মৃত্যুটা এই কেসের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে।"

"কিন্তু মৃত্যুটা তো স্বাভাবিক। এর মধ্যে রহস্য কোথায়? উৎপল হাজরা যা বলেছিল, তেমনটাই তো তুমি বুঝেশুনে এলে পদ্মনাভবাবুর বাড়িতে গিয়ে।"

বাবার প্রশ্নের উত্তরে দীপকাকু বলেছিলেন, "উপর-উপর স্বাভাবিক। নবারুণ না বললে তো জানতেই পারতাম না ছেলেমেয়েকে নিয়ে অশান্তিতে ভুগছিলেন পদ্মনাভবাবু। তা হয়তো এমন মাত্রা ছাড়ায়, প্রেশার, সুগারের পেশেন্ট পদ্মনাভবাবু অসুস্থ হয়ে পড়েন। অশান্তির জেরেই মৃত্যুটা ত্বরান্বিত হয়।"

"তা বলে তো তুমি ছেলেমেয়েকে সরাসরি খুনি বলতে পারো না," বলেছিলেন বাবা।

দীপকাকু বললেন, "না, তা পারি না। কিন্তু মজাটা হচ্ছে রহস্য উপন্যাসের লেখক সন্তানদের ছেড়ে দিয়ে উৎপল হাজরাকে খুনি সাব্যস্ত করলেন। কেন? বাবার মৃত্যুর দায় থেকে ছেলেমেয়েকে আড়াল করতেই কি উৎপলবাবুকে খুনি হিসেবে বেছে নিলেন? ছদ্মনামের আড়ালে ছেলে অথবা মেয়েই কি উপন্যাসটা লিখেছেন? বাড়ি নিয়ে অশান্তির বদলে দুর্মূল্য স্ট্যাম্পের প্রসঙ্গ এসে পড়ল কেন গল্পে? বাবার সঙ্গে মনোমালিন্য, দোকানটা বাবার করে দেওয়া, এইসব কথা অরিন্দমবাবু আমাকে বলেননি। উৎপল হাজরাও কি জানতেন না ছেলেমেয়ের সঙ্গে অশান্তির কথাটা? যদি না জানেন, ধরে নিতে হবে উনি যতটা পদ্মনাভবাবুর কাছের লোক মনে করতেন নিজেকে, ততটা ছিলেন না।"

কথার ফাঁকে ঝিনুক বলে উঠেছিল, "অরিন্দমবাবুও মনে করতেন উৎপল হাজরা খুব কাছের লোক ছিলেন তাঁর বাবার।"

অভিযান-এর উল্লেখযোগ্য ছোটোদের বই

তিন শতাব্দীর সেরা ভূত ২৫০

আনন্দবাজারে বেস্টসেলার চারটি বই

আমার শিক্ষক
শিক্ষক বিষয়ক গদ্য ও ছবির কিশোর সংকলন। ১৫০

আমার মা
মা বিষয়ক একটি চিঠি-কবিতা-গল্প-উপন্যাস-ছবির কিশোর সংকলন। ২০০

আমার বাবা
বাবা বিষয়ক একটি চিঠি-কবিতা-গল্প-স্মৃতিকথা-ছবির কিশোর সংকলন। ২০০

ছোটোবেলার প্রিয় শখ ২২৫
বিখ্যাত মানুষদের ছোটোবেলার প্রিয় শখ এবং আজকের ছোটোদের প্রিয় শখ নিয়ে একটি সংকলন।

এলাটিং বেলাটিং ক্রিকেটিং
অলক চট্টোপাধ্যায় ১০০
ক্রিকেটের বিচিত্র রং-বেরঙের কাণ্ড, অদ্ভুত সব রেকর্ডের গল্প আর হারানো দিনের চরিত্র ইত্যাদি নিয়ে এই বই।

চিরায়ত শিশু-কিশোর সাহিত্য সিরিজ
ক্ষীরের পুতুল অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ৫০
বুড়ো আংলা অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ৮০
নালক অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ৪০
চাঁদের পাহাড় বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ৮০

জসীম উদ্দীন: জীবন ও সাহিত্য
সম্পাদনা এন জুলফিকার ৩৫০

সম্বিতা দত্ত
গোয়েন্দা রিচিক ৬০
ফ্রুরবার্গের ফন্দিবাজ ৮০
গোয়েন্দা গল্প সংকলন
রতনতনু ঘাটী

ভূতের লেখা বই ৮০
বাঘ শিকারি রাজামশাই ৬০
বাঘ নিয়ে মজাদার ও ভয়ঙ্কর গল্প সংকলন
ডাকাত বনাম ডাকু ২৫
বিভুতিভূষণ মণ্ডল

অ্যাডভেঞ্চার গল্প সংকলন
যত কাণ্ড পাখি নিয়ে আবীর গুপ্ত ৩৫
দেশ বিদেশের নানান পাখি বিষয়ক ছোটোদের সংকলন

শ্রেষ্ঠ ছড়া শ্যামলকান্তি দাশ ৭০
বাংলা অকাদেমি পুরস্কারপ্রাপ্ত ছড়া সংকলন
ভুজাং যখন ভূত শুভজিৎ গুপ্ত ৬০

অভিযান পাবলিশার্স
৬৪/১ কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩
+৯১ ৮০১৭০৯০৬৫৫
email:
Abhijan Publishers on Facebook:

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com

"রাইট। হয়তো দু'জনেই ভুল বুঝেছিলেন পদ্মনাভবাবুকে," বলার পর দীপকাকু ফের নিজের পর্যবেক্ষণ বর্ণনা করতে লাগলেন, আমার এত প্রশ্ন বা ধন্দের মধ্যে একটার উত্তর আমি পদ্মনাভবাবুর ঘরে গিয়ে পেয়ে গিয়েছি। সেটা হচ্ছে, ছদ্মনামের লেখক পদ্মনাভবাবুর আশপাশের কেউ নয়। এমনকী, স্ট্যাম্প কালেক্টারদের কেউ না হওয়ারই সম্ভাবনা বেশি।"

ঝিনুক অবাক হলেও তখন কিছু বলেনি। বাবা বিস্ময় প্রকাশ করে বলেন, "সে কী, কেসটা তো তা হলে বেশ জটিল হয়ে গেল। ছেলে বা মেয়ে লেখক নয়, ডাকটিকিটটা ফেরত পাওয়ার জন্য তাদেরই লেখক হওয়ার কারণ ছিল বেশি। আমি তো লেখকের লিস্টে উৎপলকেও রেখেছিলাম। ভেবেছিলাম, লোকটা হয়তো অন্য চালে খেলাটা খেলছে। তুমি কী করে বুঝলে, লেখক পদ্মনাভবাবুর কাছের লোক নয়? অথচ নভেলটা এমন ভাবে লেখা হয়েছে, লেখক যেন চোখের সামনে সমস্ত ঘটনাটা ঘটতে দেখছে।"

"পদ্মনাভবাবুর ঘরের জানলার পাশে ত্রিফলা বাতির মাথা এবং আরও অনেক কিছু আমাকে এমনটা ভাবতে বাধ্য করেছে। আপনাদের নিশ্চয়ই খেয়াল আছে নভেলে ক্লাইম্যাক্সের পরের বর্ণনাটা, 'খুনি ঘরের আলো নিভিয়ে ছায়ার মতো নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল। দূরে থাকা স্ট্রিটল্যাম্পের ম্লান, দুঃখী আলোটা জানলা গলে ছুঁয়ে রইল পালঙ্কে পড়ে থাকা ছুরিকাহত প্রভাকর চৌধুরীর নিথর দেহ'। এর থেকেই প্রমাণ হয়, জানলার পাশের ত্রিফলা বাতির অস্তিত্ব লেখকের জানা নেই। ল্যান্ডফোন পাশের ঘরে থাকে না।"

ঝিনুক বলে উঠেছিল, "মিষ্টু এবং টিয়াপাখির উল্লেখ উপন্যাসে কোথাও নেই।"

"একদম ঠিক," বলেছিলেন দীপকাকু।

বাবা বললেন, "গল্প লিখতে গেলে যে সব কথা লিখতে হবে, তার কোনও মানে নেই। কিছু বাদ দিতে হয়, কল্পনার আশ্রয় নিতে হয় বাকিটায়। যেমন এখানে খুনটা লেখকের কল্পনা।"

দীপকাকু বলেছিলেন, "না, রজতদা। এই কাহিনিকে অন্য গল্প-উপন্যাসের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলবেন না। সত্য উন্মোচনের প্রয়াসে নভেলটা লেখা হয়েছে। কাহিনিকে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে লেখক চাইবেন ঘটনার প্রেক্ষাপট, চরিত্র সব কিছুর সঙ্গে যেন বাস্তবের মিল থাকে। আর খুনের ঘটনাটা হচ্ছে একটা ইঙ্গিত, মৃত্যুটা স্বাভাবিক নয়, সেটা বলার চেষ্টা। আগে ভেবেছিলাম কাহিনিকে জমজমাট করার জন্য খুনটা আনা হয়েছে। ছেলেমেয়ের সঙ্গে অশান্তিটা জানার পর থেকে মনে হচ্ছে, খুনটাকে কল্পনা না ভাবাই ঠিক হবে। একই ভাবে গাঁধীজির দুষ্প্রাপ্য স্ট্যাম্পটাও এখানে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠছে। লেখক খুনের কথা বললেন, অশান্তির কথা বললেন না। স্ট্যাম্পকে খাড়া করলেন সামনে। এর পিছনে কারণ তো একটা আছেই। সবচেয়ে বড় রহস্য, আমরা তদন্তে নামতে না-নামতেই কেন আমাদের ফলো করা হচ্ছে? এই সব প্রশ্নের উত্তর পেতে গেলে প্রধান চাবিকাঠি, মানে লেখকের কাছে আমাদের পৌঁছতেই হবে। লেখক যেহেতু পদ্মনাভবাবুর কাছাকাছির কেউ নয়, তাই তাঁকে খুঁজতে বেশ বেগ পেতে হবে আমাদের। কাছাকাছির নয়, এই কারণে নিশ্চিত হচ্ছি, নভেলটা পদ্মনাভবাবুর মৃত্যুর পর লেখা হয়েছে। মৃত্যুর খবর পেয়ে মেয়ে তো এসেই ছিলেন এই দেশে, বাবার স্ট্যাম্প অ্যালবাম বিক্রি করে দিয়ে যান। স্ট্যাম্প কালেক্টারদের মধ্যে পদ্মনাভবাবুর প্রিয় মানুষরাও এসেছিলেন শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে। তাঁদের কেউ যদি লেখক হন এবং গিয়ে থাকেন পদ্মনাভবাবুর ঘরে, ত্রিফলা বাতির অস্তিত্ব তাঁর চোখে পড়তই। ক্লাইম্যাক্সের পরের অংশটা তখন এমন হত না। কারণ, লেখক কাহিনির প্রেক্ষাপট আগাগোড়া বাস্তবসম্মত করার চেষ্টা করে গিয়েছেন। মামলার ভয়েই চরিত্রের আসল নামগুলো হয়তো লেখেননি।"

"ছদ্মনামে যখন লিখেছেন, মামলার ভয় পাচ্ছেন কেন? ওঁকে তো খুঁজে পাওয়া যাবে না," বলেছিল ঝিনুক।

দীপকাকু বললেন, "পাওয়া যাবে। কোর্টের চিঠি পত্রিকা অফিসে পৌঁছলে, ওঁরা লেখকের আসল নাম-ঠিকানা জানাতে বাধ্য থাকবেন।"

আলোচনা সেই পর্যায়ে শেষ হয়েছিল। গতকাল থেকে একটা ছোট্ট প্রশ্ন বয়ে বেড়াচ্ছে ঝিনুক, জিজ্ঞেস করার মতো পরিস্থিতি পাচ্ছিল না। সুযোগ পেতেই দীপকাকুর কাছে জানতে চায়, "কাল আপনি পদ্মনাভবাবুর বাড়ি থেকে বেরিয়ে অরিন্দমবাবুকে কেমন বুঝলাম জিজ্ঞেস করলেন। মিষ্টুর বেলায়ও সেই একই প্রশ্ন করলেন কেন? ওইটুকু বাচ্চাকে বোঝার কী আছে।"

দীপকাকু বললেন, "অনেক কিছু বোঝার আছে। মিষ্টুর সঙ্গে ওর ঠাকুরদার যে রকম ঘনিষ্ঠতা ছিল, নিশ্চয়ই পদ্মনাভবাবুর স্ট্যাম্প অ্যালবামের কাছাকাছি পৌঁছে যেতে পারত সে। নেহাতই খেলাচ্ছলে সেই দুর্মূল্য স্ট্যাম্পটা কি মিষ্টুই সরিয়েছে? কোথায় রেখেছে, পরে নিজেই ভুলে গিয়েছে। ভুলে যাওয়ার কথাটা নিশ্চিত ভাবে এই কারণে বলছি, ডাকমাশুল উপন্যাসটা পড়ার পর অরিন্দমবাবু নির্ঘাত মিষ্টুকে জিজ্ঞেস করেছেন, দাদুর অ্যালবাম থেকে নেওয়া কোনও ডাকটিকিট আলাদা সরিয়ে রেখেছে কিনা? মিষ্টু যদি মনে রাখতে পারত, নভেলটা লেখা হত না। অরিন্দমবাবু নিজে যদি স্ট্যাম্পটা সরিয়ে থাকেন, মিষ্টুকে প্রশ্নটা করবেন না। এ ছাড়াও একটা সম্ভাবনার কথা আমার মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে, পদ্মনাভবাবু নিজেই ওই দুষ্প্রাপ্য ডাকটিকিটটা নাতির জন্য আলাদা কোথাও সরিয়ে রাখেননি তো? মিষ্টু বড় হয়ে সেটা হাতে পাবে। পদ্মনাভবাবুর এই উত্তরসূরির ডাকটিকিটের প্রতি আগ্রহ দেখা দিচ্ছিল। পদ্মনাভবাবু খুশি হয়ে তাঁর সংগ্রহের সবচেয়ে দামি, দুষ্প্রাপ্য স্ট্যাম্প হয়তো নাতির জন্য রেখে গিয়েছেন। লেখকের ধারণায় সেটা চুরি হয়েছে।"

এ কথার পর বাবা জানতে চান, "নাতি জানবে কী করে ঠাকুরদা কোথায় সরিয়ে রেখেছে ডাকটিকিট?"

"সে ব্যাপারে নিশ্চয়ই কোনও বুদ্ধি খাটিয়ে গিয়েছেন পদ্মনাভবাবু। এমন ব্যবস্থা করেছেন, মিষ্টু বড় হয়ে যেন ডাকটিকিটটা হাতে পায়। পদ্মনাভ সেটা কোনও বিশ্বস্ত ব্যক্তির কাছেও রেখে যেতে পারেন। মিষ্টু বড় হওয়ার পর সেই ব্যক্তি স্ট্যাম্পটা ওর হাতে তুলে দেবে। অথবা পদ্মনাভবাবু ওটা এমন জায়গায় রেখেছেন, সঠিক বয়সে গিয়ে মিষ্টু ডাকটিকিটটা অটোমেটিক্যালি হাতে পেয়ে যাবে।"

দীপকাকু থামতেই বাবা বলেছিলেন, "সেই ব্যক্তি বা স্থানের কোনও আভাস কি তুমি পাচ্ছ?"

"না, এখনও পাইনি," বলেছিলেন দীপকাকু।

ঝিনুক বুঝেছিল, কেস একেবারে অথই জলে। একটা খাম উইথ স্ট্যাম্প, ওইটুকু জিনিস, ওই বাড়িতে কোথায় কিংবা বাইরের কোন ব্যক্তির কাছে আছে, খুঁজে পাওয়া ভীষণ কঠিন।

"মিস্টার বাগচি! দীপঙ্কর বাগচি!"

মহিলা রিসেপশনিস্টের ডাকে সংবিৎ ফেরে ঝিনুকের। ডাকটা দীপকাকুর কানে যায়নি, ঘাড় হেলিয়ে টিভি দেখে যাচ্ছেন। সামান্য ঠেলা দিয়ে ঝিনুক বলে, "ডাকছে।"

"অ্যাঁ, হ্যাঁ," বলে ধড়মড় করে চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়েন দীপকাকু। রিসেপশনের দিকে এগিয়ে যান। যিনি ডেকেছিলেন বললেন, "পার্থ রায়ের সঙ্গে দেখা করবেন তো? এঁর সঙ্গে চলে যান।"

কাউন্টারের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা অ্যাটেনডেন্টকে দেখিয়ে কথাটা বললেন মহিলা।

লোকটির সঙ্গে লিফটে করে চারতলায় উঠল ঝিনুকরা। লম্বা করিডোর দেখিয়ে অ্যাটেনডেন্ট বললেন, "লাস্ট ডান দিকের দরজাটা পার্থবাবুর কেবিন।"

দীপকাকু, ঝিনুক সুইং ডোর ঠেলে কেবিনে ঢুকতেই টেবিলের ওপারে বসে থাকা সুবেশ, সৌম্যদর্শন ভদ্রলোক বললেন, "আপনিই দীপঙ্কর বাগচি?"

নমস্কারের ভঙ্গি করে দীপকাকু বললেন, "হ্যাঁ। আর এ আমার অ্যাসিস্ট করে, আঁখি সেন।"

কলেজ ছুটি থাকলে ভালনামটা ঝিনুকের নিজের কানেই কেমন

যেন অচেনা ঠেকে। চল্লিশের কাছাকাছি বয়সের পার্থ রায় ঝিনুককে "হ্যালো," বলে সম্ভাষণ করলেন। সামনের চেয়ার দেখিয়ে বসতে নির্দেশ করলেন দু'জনকে।

ঝিনুকরা বসার পর পার্থ রায় দীপকাকুর উদ্দেশে বললেন, "আপনাদের অনেকটা সময় ওয়েট করতে হয়েছে। সরি। এডিটোরিয়াল মিটিং ছিল। বলুন, কী ব্যাপার?"

"সে রকম কিছু না, আপনাদের শারদীয়া সংখ্যায় পারমিতা গুপ্তর উপন্যাসটা পড়লাম। ওঁর আসল নাম-ঠিকানা কাইন্ডলি যদি বলেন," বললেন দীপকাকু।

পার্থ রায় বললেন, "নামটা যে আসল নয়, জানলেন কী করে?"

"আমার কাজটাই তো এই। তা ছাড়া পাঠকমহলে উপন্যাসটা বেশ সাড়া ফেলেছে। পারমিতা গুপ্তর নামটা লেখক হিসেবে প্রথম দেখা গেল। আমার আগে অনেকেই খোঁজ নিয়ে জেনেছেন, নামটা ছদ্মনাম। আমি লেখকের প্রকৃত পরিচয়টা জানতে এসেছি।"

"আপনার কাছে কোনও অথারাইজেশন আছে। নামটা জানার আইনি অধিকার?"

প্রশ্নটায় অপ্রতিভ হয়ে পড়লেন দীপকাকু। বললেন, "পছন্দের লেখকের আসল নাম জানতে কোনও অথরাইজেশন লাগে নাকি? লেখা ভাল লাগার পর থেকেই পাঠকের অধিকার জন্মে যায় লেখক সম্বন্ধে জানার।"

চতুর হাসি হাসছেন পার্থ রায়। বলে ওঠেন, "আপনি শুধু পাঠক নন, আরও একটা বিশেষ পরিচয় আছে। আপনার দেওয়া কার্ড থেকেই জানলাম। তা ছাড়া লেখক যখন ছদ্মনাম ব্যবহার করছেন, বোঝাই যাচ্ছে প্রকৃত নাম গোপন রাখতে চান। সম্পাদক হয়ে আমি তার ইচ্ছেটা অমান্য করতে যাব কেন? লেখকের সেই শর্তেই তো লেখাটা আমি ছেপেছি।"

"আপনার অনমনীয়তা থেকে এটা অন্তত বোঝা যাচ্ছে, উপন্যাসটার জন্য ছদ্মনামটা খুবই জরুরি ছিল। যাই হোক, আপনার ব্যস্ত সময়ের খানিকটা নষ্ট করার জন্য মার্জনা চাইছি। আসি," বলে হাতজোড় করে নমস্কার জানিয়ে চেয়ার থেকে উঠে পড়লেন দীপকাকু। সম্পাদক পার্থ রায়ের মুখটা থমথমে হয়ে রইল।

অন্নপূর্ণা পত্রিকার অফিস থেকে বেরিয়ে ঝিনুকরা কলেজ স্ট্রিটে চলে এসেছে। 'গোস্বামী প্রকাশন' সংস্থার প্রকাশকের সঙ্গে কথা বলবেন দীপকাকু। ঝিনুকদের বসানো হয়েছে তাঁর ঘরে। প্রকাশক অনিমেষ সোম এখন সিটে নেই। এই প্রকাশনা থেকেই ডাকমাশুল উপন্যাসটা বই আকারে বেরোবে। লেখকের আসল পরিচয়ের সন্ধানে এখানে এসেছেন দীপকাকু। অন্নপূর্ণার অফিস থেকে বেরিয়ে স্বগতোক্তির ঢঙে দাঁত চিবিয়ে বলেছিলেন, "কতদিন লেখককে আড়াল করে রাখবে আমিও দেখব।"

এর পরই ফোন করেন উৎপল হাজরাকে। ডাকমাশুল উপন্যাসটা যে প্রকাশন সংস্থা বই করবে বলে বিজ্ঞাপন দিয়েছিল কাগজে, তাদের নাম-ঠিকানা, প্রকাশকের নাম জেনে নেন। জিজ্ঞেস করেন, স্ট্যাম্প কালেক্টার, ডিলাররা আগের মতোই ফোনে বিরক্ত করে যাচ্ছে কিনা?

ফোনের এক প্রান্তের, মানে দীপকাকুর কথা শুনে মনে হল উৎপলবাবুকে একজন ডিলার বেশি জ্বালাচ্ছে। একদিন উৎপলবাবুর বাড়িতেও চলে এসেছিল টাকা নিয়ে। স্ট্যাম্পটার আসল যা দাম হওয়া উচিত, তার চেয়ে অনেক কম টাকা। ডাকটিকিটটা না পেয়ে হালকা করে থ্রেটনিং দিয়ে গিয়েছে সে। দীপকাকু ফোনের এ প্রান্ত থেকে শেষ কথা বলেছেন, "ডিলারের সম্বন্ধে সমস্ত তথ্য জোগাড় করে রাখুন। পরে আপনার থেকে জেনে নেব।"

অন্নপূর্ণার অফিসের মতো এখানেও অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করতে হচ্ছে। কিন্তু ততটা বিরক্তি বা অধৈর্য ভাব তৈরি হচ্ছে না ঝিনুকের। তার কারণ সম্ভবত অন্নপূর্ণার মতো এদের অফিস ঝাঁ চকচকে নয়। সরু গলির ভিতর দেড়শো-দু'শো বছরের পুরনো বাড়ি। ঘরের দেওয়াল দেখা যাচ্ছে না। ছাদ পর্যন্ত বইয়ের র‍্যাক, লোহার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

র‍্যাকভর্তি নতুন বই। ঘরটার মধ্যে একটু স্যাঁতসেঁতে ভাব। সব মিলিয়ে গোটা পরিবেশে বিনয় আর আন্তরিকতা মিশে আছে।

ঝিনুকদের ইতিমধ্যে চা দেওয়া হয়েছে। কাপ-প্লেটের ডিজ়াইন বেশ পুরনো। চায়ের স্বাদও আদ্যিকালের। এক চুমুক দিয়েছে ঝিনুক। দীপকাকু ঢাউস টেবিল থেকে একটা বই তুলে পড়তে-পড়তে বোধ হয় ডুবে গিয়েছেন। ঝিনুক চার দেওয়ালে র‍্যাকের দিকে তাকিয়ে বইয়ের নাম পড়ে যাচ্ছে শুধু। কত রকমের বই। এসবের মধ্যে দীপকাকুর একটা নির্দেশ কিন্তু মাথায় রেখে দিয়েছে। এখানে ঢোকার আগে উনি বলেছেন, "আমরা এখানে ছদ্ম পরিচয়ে ঢুকছি। সিনেমার লোক হয়ে।"

সিনেমার লোক পরিচয়টা তদন্তে বেশ কাজে দেয়। সিনেমাজগতের প্রতি মানুষের আকর্ষণ চিরকালীন।

ঝিনুকের বাঁপাশের দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকলেন বছর সত্তরের এক ভদ্রলোক। অভিজাত চেহারা, পরনে ধুতি-পাঞ্জাবি। বলে না দিলেও চলবে, ইনিই প্রকাশনার কর্ণধার। ঝিনুক চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে, দীপকাকুও তাই। নমস্কার বিনিময় হল কর্ণধার, দীপকাকুর মধ্যে।

চেয়ারে বসে অনিমেষ সোম বললেন, "হ্যাঁ বলুন, কী বলবেন?"

ঝিনুকরাও চেয়ারে বসেছে। দীপকাকু বললেন, "বিজ্ঞাপনে দেখলাম ডাকমাশুল উপন্যাসটা আপনারা বই করবেন। আমরা লেখকের সঙ্গে একবার দেখা করতে চাই। আপনি কি হেল্প করতে পারবেন?"

"কেন দেখা করতে চান? দেখা করার জন্য আমার হেল্প লাগছে কেন?"

দীপকাকু বললেন, "উনি যেহেতু ছদ্মনামে লেখেন, তাই কিছুতেই ট্রেস করতে পারছি না। অন্নপূর্ণা পত্রিকার অফিস থেকে অ্যাড্রেস, ফোন নম্বর কোনওটাই দিচ্ছে না আমাদের। ওদের নাকি নিয়ম নেই। এদিকে লেখকের পারমিশন ছাড়া স্ক্রিপ্টে হাত দিতে পারছি না আমরা।"

"স্ক্রিপ্ট।" কথাটা রিপিট করে কপাল কুঁচকে তাকালেন অনিমেষ সোম।

উত্তরে দীপকাকু বললেন, "হ্যাঁ, সিনেমার স্ক্রিপ্ট। ডাকমাশুল গল্পটার আমরা সিনেমা করতে চাই। এর জন্য তো লেখকের অনুমতি লাগে। গল্পের রাইট কেনার কারণেই ওঁর সঙ্গে যোগাযোগ করতে চাইছি।"

"সিনেমা হবে? সে তো ভাল কথা! বইটার বিক্রি বাড়বে। লাভ হবে আমার। লেখকের নাম-ঠিকানা আমি আপনাকে দেব। আমারও ওঁর সঙ্গে যোগাযোগ করতে বেগ পেতে হয়েছে। বই করতে চাইলে আমাদেরও তো অনুমতি লাগে। কন্ট্র্যাক্ট পেপারে সাইন করাতে হয়। এই তো, গত পরশু পারমিতা গুপ্ত এখানে এসে কন্ট্র্যাক্টে সই করে গেলেন।"

অনিমেষ সোম থামতেই দীপকাকু জিজ্ঞেস করলেন, "ওঁর আসল নাম কী?"

মুখে হাসি খেলে গেল অনিমেষবাবুর। বললেন, "এই ভুল খবরটা আমার কানেও এসেছিল জানেন। পারমিতা গুপ্ত নাকি ছদ্মনাম। আসলে পাকা হাতে লেখা, নতুন নাম। লোকে ধরে নিয়েছে কোনও নামী লেখক বুঝি ছদ্মনামে লিখেছেন। ছদ্মনাম ব্যবহার তো আজকের ব্যাপার নয়। ভদ্রমহিলা যখন কন্ট্র্যাক্ট পেপারে পারমিতা গুপ্ত নামটা নিজে লিখলেন, সইও করলেন, তখনই আমার ভুলটা ভাঙল।"

অনিমেষবাবুর কথাগুলো এতটাই অপ্রত্যাশিত, দীপকাকু খানিকক্ষণ চুপ করে রইলেন। ঝিনুকের মাথা তো একেবারেই গুলিয়ে গিয়েছে। সন্দিগ্ধ কণ্ঠে দীপকাকু এবার জানতে চাইলেন, "ভদ্রমহিলার বয়স কত?"

"তা ধরুন, ষাটের কাছাকাছি তো হবেই। একমাথা সাদা চুল। কল্পপ করলে বয়স বুঝতে অসুবিধে হত," বললেন অনিমেষবাবু।

দীপকাকুর গলার স্বরে এখনও সন্দেহ। বলে উঠলেন, "লেখা পড়ে তো অত বয়স্ক মনে হয় না। এমন সব আধুনিক প্রযুক্তির কথা অনায়াসে নভেলটায় এনেছেন, বোঝা যায় মর্ডান দুনিয়ার ইয়াং একজন কেউ।"

দীপকাকুর ভুল ভাঙাতে ফের উদ্যত হলেন অনিমেষ সোম। বললেন, "বয়স ষাট মতো হলে কী হবে। ভদ্রমহিলা যথেষ্ট আধুনিক। হাতে চওড়া ফোন, ট্যাব না কী যেন বলে, স্টাইলিশ চশমা। সাদা চুল ছোট করে কাটা, কাঁধ পর্যন্ত। নিজে গাড়ি চালিয়ে এসেছিলেন।"

"কী করে বুঝলেন? আপনাদের অফিসের গলিতে তো গাড়ি ঢুকবে না।"

দীপকাকুর কথার উত্তরে অনিমেষবাবু বললেন, "গাড়ি মেন রোডে পার্ক করা ছিল। উনি গাড়ি চালিয়ে এসেছেন, হাতের চাবিটা দেখে বুঝেছিলাম। কন্ট্র্যাক্টে সই করার পর এখানে বসে খানদশেক বই কিনলেন আমাদের প্রকাশনার। ক্যারিব্যাগে দেওয়া হয়েছিল বই। অত ভারী ব্যাগটা বয়ে নিয়ে যাবেন মহিলা, খারাপ দেখাচ্ছিল। বাবলাকে ডেকে বললাম, বইয়ের ব্যাগটা গাড়িতে তুলে দিয়ে আসতে। উনি না-না করছিলেন। বাবলা তুলে দিয়ে এসেছিল ব্যাগটা।"

"বাবলা নিজের চোখে দেখেছে, উনি গাড়ি চালিয়ে চলে গেলেন? ড্রাইভিং সিটে অন্য কেউ ছিল না?"

"সে কথা তো আমি আর জানতে চাইনি বাবলার কাছে। জানতে চাইবই বা কেন? ড্রাইভার গাড়িতে থাকলে ভদ্রমহিলা হাতে চাবি থাকার কথা নয়।"

দীপকাকু বললেন, "ব্যাপারটা নিয়ে আপনার খটকা লাগছে না? ভদ্রমহিলার যা বয়স বলছেন, ওই বয়সে ক'জন মহিলা অফিসটাইমে মহাত্মা গাঁধী রোডের মতো বিচ্ছিরি রাস্তায় গাড়ি চালানোর ঝুঁকি নেবেন? খুব এমারজেন্সি হলে আলাদা কথা। কাজটা তো সেরকম জরুরি ছিল না। ট্যাক্সিতেও আসতে পারতেন।"

কপালে ভাঁজ পড়ল অনিমেষবাবুর। জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি ঠিক কী বলতে চাইছেন, পরিষ্কার করে বলুন তো।"

"আমি যেটা বলতে চাইছি, আপনি ভাল ভাবে উপলব্ধি করবেন, যদি অফিস থেকে বেরিয়ে একঘণ্টা মতো এম জি রোডের দিকে তাকিয়ে থাকেন। ওই বয়সি একজন মহিলাকেও দেখবেন না ড্রাইভ করতে। আমার বক্তব্য উনি যদি সত্যিই গাড়ি চালিয়ে থাকেন, তা হলে বয়সটা সঠিক নয়।"

"এ আবার কী কথা। কখনও শুনছি ছদ্মনাম, আপনি বলছেন, বয়স বেঠিক। অদ্ভুত কাণ্ড।" বলে অনিমেষবাবু হাঁক পাড়লেন, "বাবলা। বাবলা আছিস না কী রে? এ দিকে একবার শুনে যা।"

বছরকুড়ির এক ছেলে পিছনের ঘরের দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল। অনিমেষবাবু তাকে বললেন, "গত পরশু পারমিতা গুপ্ত, সাদা বব চুলের এক ভদ্রমহিলা এসেছিলেন না, যাঁর গাড়িতে তুই বই তুলে দিয়ে এলি, গাড়িতে কোনও ড্রাইভার ছিল?"

বাবলা মাথা নেড়ে বলল, "না, উনিই গাড়ি চালিয়ে চলে গেলেন।"

"গাড়ির নম্বর কি তুমি দেখেছ? মনে আছে?" জিজ্ঞেস করলেন দীপকাকু।

বাবলা ফের মাথা নাড়ল। অনিমেষবাবু বাবলাকে বললেন, "যা, তুই এখন ভিতরে যা।"

চলে গেল বাবলা। টেবিলে কনুইয়ের ভর দিয়ে একটু ঝুঁকে অনিমেষবাবু দীপকাকুকে জিজ্ঞেস করলেন, "কী বুঝছেন, এবার বলুন?"

দীপকাকু চিন্তিত গলায় বললেন, "ভাল বুঝছি না। লেখক সম্বন্ধে প্রথমে শুনলাম ছদ্মনাম। এখানে যিনি সই করে গেলেন, আন্দাজ করতে পারছি বৃদ্ধার ছদ্মবেশ নিয়েছিলেন। আসল মানুষ সই করলেন তো? পরে কোনও আইনি ঝামেলায় জড়িয়ে পড়বেন কিনা, সেটা নিয়েই চিন্তা।"

"এ তো মহা গেরোয় পড়া গেল।" বললেন, অনিমেষ সোম। কণ্ঠে উদ্বেগ।

দীপকাকু বললেন, "উনি চলে যাওয়ার পর ফোনে কি আর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোনও কথা হয়েছে আপনার সঙ্গে?"

"না, দরকার পড়েনি।"

"ওঁর নম্বরে একবার কল করুন তো, দেখুন পান কিনা? পেলে যা হোক কিছু একটা বলবেন। যেমন, প্রচ্ছদ উনি দেখতে চান কিনা, জিজ্ঞেস করবেন।"

অনিমেষবাবু পিছনের ঘরের উদ্দেশে হাঁক দিলেন, "প্রশান্ত, পারমিতা গুপ্তর ফাইলটা পাঠাও তো।"

অনিমেষবাবুর ভারী শরীরটা তিরতির করে নড়ছে। টেনশনের চোটে পা নাচাচ্ছেন টেবিলের নীচে। ঝিনুকেরও কম উত্তেজনা হচ্ছে না, ফোন নম্বরটা কার? রাইটারের হয়ে কে সই করে গেল কন্ট্র্যাক্টে?

বাবলাই নিয়ে এল পারমিতা গুপ্তর প্লাস্টিক জ্যাকেটের নতুন ফাইল। হাতে নিলেন অনিমেষবাবু। ভিতরের শেষ পাতায় চোখ বুলিয়ে টেবিলে থাকা ফোনের রিসিভার তুলে নিলেন কানে। ফাইলের পাতায় লেখা নম্বরগুলো দেখে-দেখে ডায়াল করলেন। প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে চোখে-মুখে ভ্যাবাচ্যাকা ভাব দেখা দিল। শঙ্কিত কণ্ঠে বললেন, "এ কী কাণ্ড! বলছে নাম্বার ডাজ নট এগজিস্ট!"

দীপকাকু বললেন, "দেখলেন তো, যা ভাবছিলাম তাই। দেখি, ফাইলটা দেখি একবার।"

ফাইল নিয়ে নম্বর দেখে দীপকাকু নিজের মোবাইল থেকে কল করলেন। ফোন সেট কানে রাখা অবস্থায় বললেন, "সেম রেজাল্ট।"

"তা হলে কী করণীয়?" বিহ্বল ভাবে জানতে চাইলেন অনিমেষ সোম।

একটু ভেবে নিয়ে দীপকাকু বললেন, "আপনি যদি রাজি থাকেন, একটা কাজ করা যেতে পারে। কন্ট্র্যাক্ট পেপারের লাস্ট পাতায় দেখছি মহিলার নাম, ঠিকানা, ফোন নম্বর এবং সই। এই পাতাটা যদি আমায় দেন, জেরক্স করে দিলেও হবে। পুলিশের সি আই ডি ডিপার্টমেন্টে আমার এক বন্ধু আছে, তাকে দিতে পারি।"

"তিনি এটা নিয়ে কী করবেন?"

দীপকাকু বললেন, "অ্যাড্রেসটা একবার ভেরিফাই করবে। যদিও জানি ওটা ভুল ঠিকানা। তবু ওর মধ্যে কোনও ক্লু পাওয়া গেলেও যেতে পারে। ফোন নম্বরটার ক্ষেত্রেও তাই। সবচেয়ে বেশি ইম্পর্ট্যান্ট জিনিসটা হচ্ছে, সই। ওদের হ্যান্ডরাইটিং এক্সপার্ট সইয়ের স্ট্রোক দেখে অনেক কিছু বলে দিতে পারে। মহিলার আনুমানিক বয়স, এই সই তিনি প্রথমবার করলেন, নাকি আগেও অনেকবার করেছেন। সইটার কিছু লেটার দেখে বোঝা যাবে, ওঁর আসল সইয়ে কোন লেটারগুলো ব্যবহার হয়... এরকম নানান বিষয় জানা যাবে। মহিলাকে শনাক্ত করতে কাজে লাগবে এসব।"

অনিমেষবাবু ফের বাবলার নাম ধরে হাঁক দিলেন। বাবলা এসে দাঁড়াল এ ঘরে। ক্লিপ দেওয়া কন্ট্র্যাক্ট পেপারের লাস্ট পেজ খুলে দীপকাকু এগিয়ে দিলেন বাবলার দিকে। অনিমেষবাবু নির্দেশ দিলেন বাবলাকে, "যা বাবা, এই পাতাটা তাড়াতাড়ি একটা জেরক্স করে নিয়ে আয়।"

বেরিয়ে গেল বাবলা, ফাইল বন্ধ করে দীপকাকু অনিমেষ সোমকে বললেন, "ভদ্রমহিলা তো বেশ খানিকক্ষণ ছিলেন এখানে, কথাবার্তা কী হল?"

"কথা খুব একটা বলেননি। আমিই বললাম, প্রথম লেখাই যদি এত ভাল, নিয়মিত লেখেন না কেন? উনি বললেন, নিয়মিত না হলেও, যা লেখেন সব ইংরেজিতে।"

"বই আছে কোনও?" জিজ্ঞেস করলেন দীপকাকু।

অনিমেষবাবু বললেন, "জানতে চাইনি। ইংরেজি বই নিয়ে আমার কোনও ইন্টারেস্ট নেই। কোনও খবরও রাখি না। উনি থাকেন দিল্লিতে, ওখানকার কোনও পাবলিশার্সই হয়তো ছেপেছে ওঁর বই।"

নতুন ইনফরমেশনে ঝিনুকের মতো দীপকাকুও হোঁচট খেলেন। বললেন, "দিল্লিতে থাকেন! অ্যাড্রেস তো দিয়েছেন কলকাতার।"

"এখানে ওঁর নিজের লোক থাকে। বাপের বাড়ি, শ্বশুরবাড়ি কোনও একটা হবে হয়তো। বলেছেন, চিঠিপত্তর দেওয়ার থাকলে, এই ঠিকানাতেই দিতে, উনি পেয়ে যাবেন। মাঝে-মাঝে কলকাতায় এসে থাকেন বেশ কিছু দিনের জন্য," বলে থামলেন অনিমেষ সোম। কী মনে পড়তে ফের বলে উঠলেন, "আচ্ছা, উনি তো দিল্লিতেও গাড়ি চালান। দিল্লিতে বহু মেয়েকে গাড়ি চালাতে দেখেছি। ওখানে যখন চালান, এখানে পারবেন না কেন?"

"ওখানে চালান বলেই এখানে আরওই পারবেন না। কলকাতায় নিয়মিত চালালে প্র্যাকটিসের মধ্যে থাকতেন। দিল্লির মতো চওড়া, ঝাঁ চকচকে রাস্তা তো এখানে প্রায় নেই। ট্র্যাফিক সিস্টেম ওদের অনেক বেশি অর্গানাইজড।"

দীপকাকুর কথা শেষ হতেই ফোটোকপি করে ঘরে ঢুকল বাবলা। কাগজ দুটো এগিয়ে ধরল অনিমেষবাবুর দিকে। ফাইল যেহেতু দীপকাকুর কাছে, হাত বাড়িয়ে নিয়ে নিলেন অরিজিনাল আর ফোটোকপি। অনিমেষবাবুকে বললেন, "একটা এনভেলপ হবে? জেরক্সটা নেব তো।"

টেবিলের কাগজপত্তর ঘেঁটে খাম খুঁজতে লাগলেন অনিমেষবাবু। দীপকাকু লাস্ট পেজটা কন্ট্র্যাক্ট পেপারের ক্লিপে আটকে দিচ্ছেন। খাম পেলেন অনিমেষবাবু, এগিয়ে দিলেন দীপকাকুর দিকে। নিজের পেজটা খামে ভরে দীপকাকু বললেন, "একটা স্লিপ মতো কিছু দিন তো। আমার নাম-ঠিকানা, কন্ট্র্যাক্ট নাম্বার লিখে দিয়ে যাই।"

একটা ছোট প্যাড এগিয়ে দিয়ে অনিমেষবাবু সামান্য অবাক গলায় বললেন, "আপনার কার্ড নেই?"

"আর বলবেন না, কিছুদিন হল ফুরিয়েছে। করতে দেওয়া আর হচ্ছে না," কথাটা বলতে-বলতেই দীপকাকু নাম-ঠিকানা, ফোন নম্বর লিখে দিলেন প্যাডে। কার্ড দিলে আসল পরিচয় প্রকাশ হয়ে যেত।

অনিমেষবাবু বলে উঠলেন, "এই ধরনের রহস্য গল্প নিয়ে সিনেমা করার জন্য আপনিই যোগ্য লোক মশাই। রহস্য গল্পের রহস্যভেদ করছেন ক্ষুরধার বুদ্ধি দিয়ে। আপনিই নিশ্চয়ই পরিচালনা করবেন ছবিটা?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও ~ www.amarboi.com ~

"না, পরিচালক আমার বন্ধু। আমি সহকারী," বিনয়ের সঙ্গে জানালেন দীপকাকু।

ঝিনুককে নির্দেশ করে অনিমেষ সোম বললেন, "এই মেয়েটি হল গিয়ে আপনাদের ছবির অ্যাকট্রেস?"

"না-না, অ্যাকট্রেস হতে যাবে কেন। গল্পের রাইট নিতে আসার সময় অভিনেত্রীর কী দরকার? ও আমার অ্যাসিস্ট্যান্ট।"

মুখ ফসকে ঝিনুকের সত্যি পরিচয়টা দিয়ে ফেললেন দীপকাকু। মাঝে-মাঝে এমন ভুলো মনের প্রমাণ দেন, গোয়েন্দা বলে লোকে বিশ্বাসই করবে না। পরিচয়টা অনিমেষবাবুর কাছেও গোলমেলে ঠেকেছে। তাই বিস্ময়ের গলায় বলে উঠলেন, "সহকারীর আবার সহকারী?"

হুঁশ ফিরল দীপকাকুর, একগাল হেসে বললেন, "ফিল্মলাইনে নানান সব ব্যাপার থাকে, বুঝলেন না।"

কোনওক্রমে ম্যানেজ হল। কিছু না বুঝেই অনিমেষবাবু বললেন, "তা অবশ্য ঠিক।"

গোস্বামী প্রকাশনা থেকে বেরিয়ে ঝিনুকরা এখন এম জি রোডের ফুটপাতে। গলি দিয়ে আসার সময় ঝিনুকের মাথায় একটা প্রশ্নের উদয় হয়েছে। এখন সেটা জিজ্ঞেস করে দীপকাকুকে, "আপনি তখন সিগনেচারের স্ট্রোকের কথা বলছিলেন, যা দেখে হ্যান্ডরাইটিং এক্সপার্ট অনেক কিছু অনুমান করবেন। ফোটোকপিতে কি স্ট্রোকের বিচার ঠিক মতো করা যাবে?"

"আমার কাছে এখন অরিজিনালটাই আছে। ফোটোকপি ক্লিপ করে দিয়ে এসেছি। প্রথম সাক্ষাৎ তো, বিশ্বাস করে অরিজিনালটা দিতে পারতেন না।"

ঝিনুক এখন বুঝতে পারছে, অনিমেষবাবুকে খাম খুঁজতে ব্যস্ত করে দীপকাকু কাজটা সেরেছেন। সেই উত্তেজনার রেশ ওঁর মধ্যে আরও খানিকক্ষণ ছিল। তারই ফল, ঝিনুকের পরিচয় দিতে গিয়ে সত্যিটা বলে ফেলা।

॥ ৪ ॥

মাঝে তিনটে দিন গেল। উৎপল হাজরার দেওয়া কেস প্রায় শেষ। লেখককে চিহ্নিত করে ফেলেছেন দীপকাকু। এখন সেটা প্রমাণ করে তথ্যটা উৎপলবাবুর হাতে তুলে দিলেই দীপকাকু পারিশ্রমিক পেয়ে যাবেন। কিন্তু উনি তা করবেন না। উৎপল হাজরাকে দেবেন না ডাকমাশুল উপন্যাসের লেখকের হদিশ। তিনি সবে এই কেসের প্রথম ধাপ পেরিয়েছেন। এখনও অনেক রহস্য উদ্ধার করা বাকি।

বাবা বলেছেন, "ওই বাকি কাজটার জন্য তো তুমি কোনও ফিজ পাবে না। মিছিমিছি খাটতে যাচ্ছ কেন?"

দীপকাকুর উত্তর হচ্ছে, "বাড়তি খাটনিটা খাটতে যাচ্ছি নিজের জন্য। গোয়েন্দা না হয়ে ভদ্রস্থ একটা চাকরি আমি জুটিয়ে নিতে পারতাম। সেটুকু যোগ্যতা আমার ছিল। কিন্তু রহস্য আমাকে বরাবর হাতছানি দেয়। গভীর আড়াল থেকে বলে, 'এসো সমাধান করো। দেখি, পার কিনা?' যে-কোনও রহস্যের মধ্যেই আমি কেমন যেন একটা চ্যালেঞ্জের সুর শুনতে পাই। তখন আর টাকাপয়সা কী পেলাম, না পেলাম মাথায় থাকে না। পুরোপুরি নেশার ঘোরে পড়ে যাই। ভাল নেশা। অনেকটা স্ট্যাম্প কালেক্টারদের মতো। বাড়ি কমপ্লিট হয়নি, স্ট্যাম্প অ্যালবাম যে ঘরে থাকে, এসি লাগিয়ে নিয়েছে।"

উদাহরণটা দীপকাকু উৎপল হাজরাকে মনে করে দিয়েছেন। গতকাল সকালে দীপকাকুর সঙ্গে ঝিনুক গিয়েছিল উৎপলবাবুর বাড়িতে। বেহালার বেশ ভিতরের দিকে বারিক পাড়া। তার প্রায় শেষ প্রান্তে পুকুরধারে উৎপলবাবুদের দোতলা বাড়ি। উপরতলায় প্লাস্টারিং, ঘরের জানলা কিছুই হয়নি। নীচের ঘরগুলোয় আহামরি কিছু নয়। আসবাব থেকে ফ্যামিলি মেম্বার সবের মধ্যেই অতি সাধারণত্বের ছাপ। একমাত্র ডাকটিকিটের ঘরটাই ঝকঝকে, পরিষ্কার। এয়ারকন্ডিশনড মেশিন লাগানো। যদিও ওই ঘরটা উৎপলবাবুর বেডরুম। তবে উনি ওখানে শোন নির্ঘাত ডাকটিকিটগুলো পাহারা দেওয়ার জন্যই। ওঁর চেয়ে শক্তিশালী গার্ড যদি পেয়ে যান, ওই ঘরটা অবশ্যই অফার করবেন।

উৎপল হাজরার বাড়িতে যাওয়ার প্রাথমিক উদ্দেশ্য, একজনের ফোটো দেখানো। ফোটোটা ডাকমাশুলের রাইটারের। সে কথা জানানো হয়নি উৎপলবাবুকে। ফোটোটা দেখিয়ে বলা হয়েছে, "আপনি এঁকে চেনেন?"

অনেকক্ষণ ধরে দেখেও মনে করতে পারলেন না উৎপলবাবু। বলেছিলেন, "না চিনি না। ইনি কে? কেন জানতে চাইছেন চিনি কিনা?"

"সেটা এখন বলছি না," বলে প্রাথমিক উদ্দেশ্য থেকে প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে ছিলেন দীপকাকু। বলেছিলেন, "পদ্মনাভবাবুর মেয়ের ইমেল আইডি আপনার কাছে আছে?"

"না। আমার সঙ্গে তেমন আলাপ হয়নি। দু'বার মাত্র দেখেছি। একবার পদ্মনাভবাবু থাকতে, শেষবার পদ্মনাভবাবুর শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে।" দীপকাকুর পরের প্রশ্ন ছিল, "পদ্মনাভবাবুর মেয়ের নাম মহুয়া, বিয়ের পর টাইটেল কী হয়েছে জানেন?"

"হ্যাঁ, সেটা জানি। বর্মণ, মহুয়া বর্মণ।"

কথাবার্তা হচ্ছিল উৎপলবাবুর বেডরুমের খাটে বসে। ঘরটা ছোট। খাট ছাড়া বসার কোনও জায়গা ছিল না। উৎপলবাবুর স্ত্রী তিনজনের জন্য অসাধারণ মুড়িমাখা দিয়ে গিয়েছিলেন। বেশ খানিকক্ষণ পরে চা। ওই সব খেতে-খেতেই প্রশ্ন-উত্তর, আলাপ-আলোচনা চলছিল। দীপকাকু যে পদ্মনাভবাবুর বাড়িতে ঘুরে এসেছেন, সেদিনই ফোনে জানিয়ে ছিলেন উৎপলবাবুকে। অনুসরণকারীর কথা বলেননি। হতে পারে সে উৎপলবাবুরই লোক। কোনও বিশেষ উদ্দেশ্যে তাকে মোতায়েন করা হয়েছে। তদন্তের পরবর্তী অংশের কিছুই জানানো হয়নি উৎপলবাবুকে। গতকাল উৎপলবাবুর বাড়িতে দীপকাকুর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ছিল, "পদ্মনাভবাবু যেদিন মারা যান, সকালেই তো আপনার সঙ্গে কথা হয়েছিল ওঁদের বাড়িতে। পদ্মনাভবাবুকে কি খুব ডিসটার্বড লাগছিল? মনে কোনও অশান্তি?"

উৎপলবাবু বলেছিলেন, "না, ঠিক ডিসটার্বড নয়, অন্যদিনের তুলনায় একটা গম্ভীর লাগছিল। আড্ডা বেশিক্ষণ জমেওনি। অথচ তার ক'দিন আগেই কত খোশমেজাজে ফোন করেছিলেন, 'কী হে উৎপল, অনেকদিন হয়ে গেল আসছ না বাড়িতে! কালেকশন কি পুরোদমে চলছে? আমিও কিন্তু পিছিয়ে নেই। সময় করে চলে এসো, নতুন কিছু পিস দেখাব। তাজ্জব বনে যাবে।'"

"দেখিয়েছিলেন নতুন কালেকশন?" প্রশ্ন করেছিলেন দীপকাকু।

উৎপলবাবু বললেন, "হ্যাঁ, চারটে রেয়ার স্ট্যাম্প আর কিছু পোস্টকার্ড দেখালেন।"

"তাজ্জব বনে যাওয়ার মতো?" জানতে চেয়েছিলেন দীপকাকু।

উত্তরে উৎপলবাবু বলেছিলেন, "হ্যাঁ, ইন্টারেস্টিং কালেকশন। বিশাল অবাক হওয়ার মতো কিছু নয়। 'তাজ্জব' কথাটা অবশ্য ওঁর মুদ্রাদোষ।"

দীপকাকুর শেষ প্রশ্ন ছিল, "শ্রাদ্ধানুষ্ঠান কি উপরের ঘরে হয়েছিল?"

"হ্যাঁ। খাওয়াদাওয়া ছাদে প্যান্ডেল করে।"

এর পর দীপকাকু উৎপল হাজরার স্ট্যাম্প অ্যালবাম দেখতে চেয়েছিলেন। নিজের সাবজেক্ট এসে যাওয়ায় উৎপলবাবুকে বেশ উৎফুল্ল দেখাচ্ছিল। কাঠের আলমারিতে সযত্নে রাখা অ্যালবামগুলোর থেকে দুটো বের করলেন। বিছানায় রেখে অ্যালবামে রাখা ডাকটিকিটগুলো সম্বন্ধে বলতে শুরু করলেন। এমন সব টেকনিক্যাল কথা বলতে লাগলেন, টার্মগুলো ঝিনুকের কাছে একেবারে নতুন। অ্যালবামের একটা পাতা তুলে বললেন, "এটা হচ্ছে ব্ল্যাক হাওয়াইড পেপার। হোয়াইট হাওয়াইড পেপারও হয়, কিছু বছর হল বেরিয়েছে। এগুলো আমি জার্মানি থেকে আনাই। এই পেপার মোটামুটি ময়েশ্চার প্রুফ, স্ট্যাম্পের তেমন ক্ষতি করে না। আর এটা হচ্ছে ক্রিস্টাল ফাইন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জ্যাকেট, এটাও বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়। এই জ্যাকেট বিভিন্ন সাইজের পাওয়া যায় বলে খামসুদ্ধ ইউজ্‌ড স্ট্যাম্প এখানেই রাখি আমরা। স্ট্যাম্প সাধারণত দু' প্রকার, মিন্ট মানে অব্যবহৃত। আঠা থাকে তাতে। আর একপ্রকার হচ্ছে, ইউজ্‌ড স্ট্যাম্প। এগুলোর দাম মিন্টের তুলনায় অনেক বেশি। ব্যবহৃত মানেই ডাকমোহর থাকবে। সেগুলো খামসুদ্ধ থাকলে আরও মহার্ঘ, এ কথা আপনাকে আমি প্রথমদিনই বলেছি। আর এক ধরনের স্ট্যাম্প হয়, যাকে বলে গাম ওয়াশ। অর্থাৎ কি না আঠাও নেই, ব্যবহারও হয়নি। এ রকমটা হওয়ার কারণ, অসতর্কতায় অথবা কারও অজ্ঞানতাবশত দু'-তিনটে কিংবা আরও বেশি অব্যবহৃত আঠাওয়ালা স্ট্যাম্প জোড়ালাগা অবস্থায় পাওয়া গেল। সেই বাঞ্চ অফ স্ট্যাম্প জলে দু'-তিন মিনিট ফেলা রাখলে আঠা ধুয়ে যাবে, আলাদা করা যাবে স্ট্যাম্পগুলো। একে বলে গাম ওয়াশ।

"এ তো গেল ডাকটিকিটের ফিজিক্যাল কন্ডিশন। এবার বলি স্ট্যাম্প প্রকাশের উদ্দেশ্যের কথা। একে মূলত দু'ভাগে ভাগ করা যায়, ডেফিনিটিভ স্ট্যাম্প, স্বদেশের পরিচয় ঘটানো দেশের বিভিন্ন সাবজেক্ট স্ট্যাম্পে তুলে ধরে। মূল্যমান ব্যবহার হয় কম, বেশি বিভিন্ন। ছাপা হয় বেশি। সব শ্রেণির মানুষ যাতে ব্যবহার করতে পারে। দ্বিতীয় ভাগ হচ্ছে, কোমেমোরেটিভ বা স্মারক ডাকটিকিট। ইউ পি এ, মানে ইউনিভার্সাল পোস্টাল ইউনিয়ন, জেনেভায় যার হেড অফিস, তাদের গাইডলাইন মেনে স্মারক ডাকটিকিট ছাপতে হয়। ইউ পি এ-র প্রাথমিক শর্ত, একটা সাবজেক্টে একটা ডাকটিকিট একবারে ছাপতে হবে। ধরুন, কোনও মহান ব্যক্তিত্ব, যাকে নিয়ে আগেও ডাকটিকিট প্রকাশ হয়েছে, পরের বার ডিজ্বাইন এবং উপলক্ষ পালটাতে হবে। সেই কারণেই স্মারক ডাকটিকিট বেশির ভাগ ক্ষেত্রে রেয়ার হয়ে যায়। ডাকমাশুল উপন্যাসে উল্লিখিত সার্ভিস লেখা খামসুদ্ধ গাঁধীজির স্ট্যাম্পটা তাই এত দুর্মূল্য..."

মাথা আর নিচ্ছিল না ঝিনুকের। উৎপলবাবু নিজের সংগ্রহের দামি স্ট্যাম্পগুলো দেখাচ্ছিলেন। যেমন, বেগম আখতারের ছবি দেওয়া স্ট্যাম্প, ওয়াটার বার্ডস, কবি নজরুল ইসলামের জন্ম সাল ভুল ছাপা হওয়া পূর্ব পাকিস্তানের স্ট্যাম্প, স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম স্ট্যাম্প। ডাকটিকিটগুলো অ্যালবাম থেকে বের করে দেখানোর সময় কখনওই হাত ছোঁয়াচ্ছিলেন না উৎপলবাবু, স্টিলের চিমটে ব্যবহার করছিলেন। ডিজ্বাইন এবং বিশেষত্ব দেখানোর জন্য আতসকাচ। ওই যত্ন ও ইতিহাস সমৃদ্ধতা থেকেই ঝিনুকের মালুম হচ্ছিল, ডাকটিকিট জগতের ব্যাপ্তি আর গুরুত্ব।

অরিন্দম নন্দীর ছেলে মিন্টুর অ্যালবামের কথা খেয়াল হয়েছিল ঝিনুকের। ওর অ্যালবাম দেখে মনে হয়েছিল, পেপার অ্যালবাম না পেয়ে প্লাস্টিক জ্যাকেটের ফোটো অ্যালবামে স্ট্যাম্প জমাচ্ছে। যদিও ওর স্ট্যাম্পগুলো অতি সাধারণ। কিন্তু দাদুর ট্রেনিংয়ে শিখেছিল ডাকটিকিট পেপারে সাঁটিয়ে রাখতে নেই। সংরক্ষণের সঠিক প্রসেস সেটা নয়।

উৎপলবাবুর সংগ্রহ দেখতে-দেখতে দামি স্ট্যাম্পগুলোর বাজার মূল্য জানতে চাইছিলেন দীপকাকু। পাঁচ থেকে তিরিশ হাজার টাকার মধ্যে ঘোরাফেরা করছিল দাম। দীপকাকু বলেছিলেন, "আপনার সংগ্রহে খুব দামি স্ট্যাম্প তার মানে নেই। চোর-ডাকাতের ভয় পাচ্ছিলেন কেন?"

উৎপলবাবু বলেছিলেন, "আছে। এক লাখ টাকা দামেরও ডাকটিকিট আছে, অন্য অ্যালবামে। দেখাচ্ছি পরে। তবে হিসেবটা ওভাবে ধরবেন না। ধরুন, আমার কাছে পাঁচ হাজার টাকার দামের স্ট্যাম্পটা আছে পঞ্চাশটা। তা হলেই আমার সংগ্রহ কত দামি হয়ে গেল ভাবুন।"

প্রসঙ্গ সূত্রে দীপকাকু জানতে চেয়েছিলেন, "আপনার মতো কালেক্টাররা স্ট্যাম্প সংগ্রহ করেন কী-কী উপায়ে?"

উৎপলবাবু বললেন, "চেনা লোকেদের পরিমণ্ডলে সার্চ চালাই। কারও বাড়িতে পুরনো চিঠিপত্র থাকলে, খাম আছে কিনা দেখি, তাতে কী স্ট্যাম্প লাগানো, সেটা রেয়ার কিনা? রেয়ার হলে চেয়ে নিই। টাকাও অফার করি। সবচেয়ে বেশি স্ট্যাম্প সংগ্রহ করি আমরা ডিলারদের কাছ থেকে। বিদেশ থেকেও স্ট্যাম্প আনায় তারা। সারা বিশ্ব জুড়ে তাদের একটা চেন কাজ করে। স্ট্যাম্প সংগ্রহের সরকারি জায়গা হচ্ছে ফিলাটেলি ব্যুরো। বড় শহরের প্রধান ডাকঘরে তাদের একটা ডিপার্টমেন্ট আছে। সরকার নতুন কোনও ডাকটিকিট প্রকাশ করলে প্রথমে তাদের কাছে পাঠায়। সরকারের এই উদ্যোগ থেকেই প্রমাণ হয় দেশের কাছে স্ট্যাম্পের মূল্য কতটা। ডাকটিকিট তো আসলে একটি দেশের অস্তিত্বের প্রতীক।"

আলোচনায় ডাকটিকিট সংগ্রহের ব্যাপারটা এসে পড়াতে দীপকাকু একটা দরকারি প্রশ্ন সেরে নিয়েছিলেন। বলছিলেন, "আচ্ছা, উপন্যাসে একটা বড় টেকনিকাল ভুলের কথা তো আপনি আমাকে বলেননি! সেখানে বৃদ্ধ সংগ্রাহক 'সার্ভিস' লেখা ডাকটিকিটটা পান ডেড লেটার অফিস থেকে। সেখানকার এক সরকারের অন্তবর্তী কাজে ব্যবহার করার জন্য যে স্ট্যাম্প, তা ডেড লেটার অফিসে যাবে কী করে? চিঠিটা আনডেলিভারড হওয়ার কথা নয়, ঘুরবে সরকারি দফতরের মধ্যেই।"

উত্তরে উৎপলবাবু বলেছিলেন, "ভুলটা আমার চোখেও পড়েছে। কিন্তু যেখানে খুনের ঘটনা গল্পে জুড়ে দিতে পারছেন লেখক, ওইটুকু বানালে কী এমন দোষের?"

"দোষ-গুণের কথা হচ্ছে না। আপনি বলেছিলেন, উপন্যাসটা পড়ে মনে হচ্ছে আপনাদের সার্কিটের কেউ লিখেছে। ডাকটিকিট সম্বন্ধে লেখকের ধারণা একেবারে স্বচ্ছ। তাই যদি হত, এই ভুলটা তিনি করতেন না। আমার তো মনে হচ্ছে, লেখক স্ট্যাম্প-জগতের কেউ নয় অথবা ভুলটা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। আপনার কী মত?" জানতে চেয়েছিলেন দীপকাকু।

হতবুদ্ধির মতো দীপকাকুর দিকে তাকিয়ে বসেছিলেন উৎপল হাজরা। দীপকাকু কিন্তু একটা সহজ হিন্ট দিয়েছিলেন রাইটারকে

MBBS BDS BE
Sure Seats
DIRECT ADMISSION
Contact :
POLY/BBA/BCA/MBA/MCA
KOL, B'LORE, MP, BIHAR, VELLORE, ORISSA, PUNE, MUMBAI
WE ASSIST IN DIRECT ADMISSION UNDER MANAGEMENT QUOTA THROUGH EXAMINATION
EDUCATION SUCCESS
Lake place, kolkata- 29
@ CHEAP RATES / BEST PACKAGES
7687080741 / 7687080742 / 9830960535
~ www.amarboi.com ~

চেনার ব্যাপারে। যাঁর ফোটো প্রথমেই দেখানো হয়েছিল উৎপলবাবুকে, উনি চিনতে পারেননি। অর্থাৎ ওঁর সার্কিটের কেউ নয়। এদিকে দীপকাকুও বলছেন লেখক যে ভুলটা করেছেন, ডাকটিকিট-জগতের কেউ না হওয়ারই কথা। এতেই উৎপলবাবুর বুঝে যাওয়া উচিত ছিল, ফোটোটা রাইটারের। না কি চিনেও না-চেনার অ্যাকটিং করেছিলেন? ঝিনুক এখনও শিওর নয়। দীপকাকুর প্রশ্নের উত্তরে শেষমেশ কোনও মতই ব্যক্ত করতে পারেননি উৎপলবাবু। বলেছিলেন, "আপনি গোয়েন্দা। বিচার বিশ্লেষণ ক্ষমতা আমার চেয়ে ঢের বেশি। আমি আপনাকে কী মতামত দেব!"

এর পর উৎপলবাবুর কাছ থেকে দীপকাকু কলকাতার চার স্ট্যাম্প ডিলারের অ্যাড্রেস, ফোন নম্বর নেন। এর চেয়ে বেশি ডিলার এ শহরে নেই। এদের মধ্যে কোন ডিলার দুর্মূল্য স্ট্যাম্পটা কিনতে উৎপলবাবুর বাড়ি চলে এসেছিলেন, না পেয়ে মৃদু হুমকি দেন, জেনে নিয়েছেন দীপকাকু। ডিলারের নাম, শেখর সামন্ত। তারাতলায় থাকেন। পদ্মনাভবাবুর সঙ্গে খুব সুন্দর সম্পর্ক ছিল। উৎপলবাবুর সঙ্গেও রিলেশন ছিল ভালই। লোকটা ইদানীং কেমন যেন পালটে গিয়েছে।

উৎপলবাবুর বাড়ি থেকে বেরিয়ে অনেকক্ষণ ধরে লাল মোরাম বিছানো রাস্তায় বাইক চালাতে হয়েছিল দীপকাকুকে। তখনই উৎপলবাবু সম্বন্ধে বলেছিলেন, "এঁদের বলা হয় ফিলাটেলিস্ট, ডাকবিশেষজ্ঞ। ডাকটিকিটের চর্চা এঁদের ধ্যানজ্ঞান। সংসারের শখ-শৌখিনতার দিকে নজর নেই। টাকা খরচ করে যাচ্ছেন ডিলারদের থেকে স্ট্যাম্প কিনে।"

ঝিনুক তখন বলেছিল, "আমার মনে হয় সার্ভিস লেখা গাঁধীজির স্ট্যাম্পসুদ্ধ খাম এঁর কাছেই আছে। যেটা পদ্মনাভবাবুর সংগ্রহ থেকে চুরি হয়েছে।"

"কী করে বুঝছ?" জানতে চেয়েছিলেন দীপকাকু।

ঝিনুক বলেছিল, "প্রথম সাক্ষাতে উৎপলবাবু আমাদের বলেছিলেন স্ট্যাম্পের ঘরে সদ্য এ সি লাগিয়েছেন। আজ খেয়াল করলাম সত্যিই মেশিনটা নতুন। আমার ধারণা, পঁচিশ লাখের ওই স্ট্যাম্পের যত্নের জন্যই কেনা হয়েছে এ সি-টা।"

দীপকাকু বলেছিলেন, "তা হলে তো ধরে নিতে হয় ওই দুষ্প্রাপ্য স্ট্যাম্পটা সত্যিই পদ্মনাভ নন্দীর কাছে ছিল। যার কোনও তথ্যপ্রমাণ এখন পর্যন্ত আমরা পাইনি। ওটা কল্পনা না বাস্তব, একমাত্র বলতে পারেন লেখক। যাঁকে চিহ্নিত করেছি ঠিকই, কিন্তু তাঁর কাছে গিয়ে বলতে পারব না আপনিই রাইটার, উপন্যাসটার বাস্তব এবং কল্পনার অংশ দুটো আলাদা করে দিন। কারণ ওঁর কাছে কী করে প্রুভ করব, উনিই লেখক। সেরকম কোনও এভিডেন্স তো আমার হাতে নেই।"

সেই এভিডেন্স জোগাড় করতে দীপকাকুর নির্দেশে ঝিনুক এখন লেখকের বাড়ির উলটো দিকের ফুটপাথে দাঁড়িয়ে। জায়গাটা লেক রোড। লেখকের বাড়িটা ছোট জায়গার মধ্যে দোতলা। নীচে দুটো দোকানঘর, পাশে মেনগেট। আন্দাজ করা যায় দোকানঘরের পিছনে গ্যারেজ। দোতলাটা লিভিং এরিয়া, সামনের দিকে খোলা বারান্দা।

রাইটারের পরিচয়টা অসম্ভব চমকপ্রদ, অন্নপূর্ণা পুজোসংখ্যার সম্পাদক পার্থ রায়ের স্ত্রী শ্রাবণী রায়। দীপকাকু বলেছেন, "পার্থ রায় এগারোটা নাগাদ গাড়ি নিয়ে অফিসে বেরোন। তারপর তুমি ওঁদের বাড়িতে ঢুকবে।"

এগারোটা চল্লিশ হয়ে গেল পার্থ রায় এখনও বেরোননি। ঝিনুক ও বাড়ি ঢুকবে অ্যাকোয়ানিল কোম্পানির প্রতিনিধি হয়ে। যাদের ওয়াটার পিউরিফায়ার বাজারে প্রথম শ্রেণির। কোম্পানির মার্কেট সার্ভেয়ার ঝিনুকের ছদ্মপরিচয়। ছদ্মবেশ বলতে, কাঁধের একটু নীচ পর্যন্ত ঝাঁকড়া কার্লড হেয়ারের উইগ, ঠোঁটের উপর বড়সড় কালো ফ্রেমের চশমা, গায়ে কোম্পানির লোগো দেওয়া অ্যাপ্রন, গলায় ঝুলছে ফল্স আইডেন্টিটি কার্ড, হাতে প্লাস্টিক জ্যাকেটের ফাইল, কাঁধে ঝোলানো ব্যাগে প্রোডাক্টের লিটারেচার এবং আরও কিছু কাগজপত্র। সবই দীপকাকু জোগাড় করেছেন। ঝিনুক বলেছিল, "এত মেকআপের দরকার পড়ছে কেন? শ্রাবণী রায় তো কখনও আমায় দেখেননি।"

দীপকাকু বলেছেন, "পার্থ রায় যখন ফিরবেন অফিস থেকে, হাজব্যান্ডকে তোমার বর্ণনা দেবেন শ্রাবণী। পার্থ রায় আমাদের চিহ্নিত করে ফেলবেন। কারণ, তিনি তোমাকে দেখেছেন আমার সঙ্গে।"

শ্রাবণী রায়ের সঙ্গে কোন অজুহাতে, কী-কী কথা বলে ওঁর হ্যান্ড রাইটিংয়ের নমুনা সংগ্রহ করতে হবে, বুঝিয়ে দিয়েছেন দীপকাকু। প্রায় পাখি পড়া করিয়েছেন। শ্রাবণী রায়ের হাতের লেখার সঙ্গে মেলানো হবে গোস্বামী প্রকাশনার এগ্রিমেন্টে রাইটারের হ্যান্ড রাইটিং। যেখানে পারমিতা গুপ্তর পরিচয় নিয়ে নিজের হাতের লেখার প্রমাণ রেখে গিয়েছেন শ্রাবণী রায়। সেখানে শুধু সই করেননি, নিজের হাতে লিখেছেন নাম-ঠিকানা, ফোন নম্বর। যদিও সবই মিথ্যে। কোনও কিছুরই অস্তিত্ব নেই। একমাত্র হাতের লেখাটাই সত্যি।

ঝিনুক যদি এখন শ্রাবণী রায়ের হাতের লেখার নমুনা সংগ্রহ করতে পারে, তার সঙ্গে হ্যান্ড রাইটিং এক্সপার্ট মেলাবেন এগ্রিমেন্টের হাতের লেখা। মিলবে এটা নিশ্চিত করে বলা যায়। দীপকাকু নির্ভুল ভাবে তাঁকে শনাক্ত করেছেন। হ্যান্ড রাইটিং এক্সপার্টের রেজাল্ট, যা হয়ে দাঁড়াবে জোরালো এভিডেন্স। সেটা সঙ্গে করে দীপকাকু আসবেন শ্রাবণী রায়ের সঙ্গে ডাকমাশুল উপন্যাস নিয়ে কথা বলতে। তখন আর শ্রাবণী রায় বলতে পারবেন না, "আমি উপন্যাসটার রাইটার নই।"

এত আড়াল, ধোঁয়াশা থাকা সত্ত্বেও দীপকাকু যে এরকম দ্রুততায় লেখককে শনাক্ত করে ফেলবেন, ঝিনুক ভাবতেও পারেনি। গোস্বামী প্রকাশনা থেকে বেরনোর পর দীপকাকু দেড়দিন কোনও যোগাযোগ রাখেননি ঝিনুকের সঙ্গে। পরশু সকালে বাড়িতে ফোন করে জানালেন, "খুঁজে পেয়েছি রাইটারকে।"

সবিস্ময়ে ঝিনুক জানতে চেয়েছিল, "কী করে পেলেন? লেখকের আসল নাম কী?"

"গিয়ে দেখাচ্ছি।"

'দেখাচ্ছি' শব্দটায় খটকা লেগেছিল ঝিনুকের, ঠিক শুনল তো? কী দেখাবেন? ডেমনস্ট্রেশন দেবেন, কীভাবে খুঁজে পেলেন লেখককে?

তেমনটাই হল। ঝিনুককে ডেস্কটপ অন করতে বলে দীপকাকু বাবাকে বলতে লাগলেন, "লেখকের খোঁজ করতে গিয়ে আমি যার-যার সঙ্গে কথা বলেছি, তাদের একজনের মধ্যেই দেখেছি রাইটারকে আড়াল করার একটা প্রয়াস আছে। তিনি হচ্ছেন অন্নপূর্ণার পুজোসংখ্যার সম্পাদক পার্থ রায়। তার মানে রাইটার পার্থ রায়ের চেনা-পরিচিতদের কেউ একজন হতেই পারেন। পার্থ রায় ফেসবুকে আছেন কিনা দেখলাম।"

কথা এখানে থামিয়ে দীপকাকু গিয়ে বসেছিলেন কম্পিউটারের সামনে। নিজের পাসওয়ার্ড দিয়ে ফেসবুক খুললেন। তারপর গেলেন পার্থ রায়ের অ্যাকাউন্টে। বললেন, "পার্থ রায়ের ফ্রেন্ড লিস্টে গিয়ে, বন্ধুদের ছবি, তথ্য কোনও সূত্রেই লেখককে খুঁজে বার করতে পারলাম না। ভাবলাম, লেখকের নিশ্চয়ই ফেসবুক অ্যাকাউন্ট নেই। পার্থ রায়ের চেনা হলে, ওঁর প্রোফাইলে রাখা ফোটোগুলোর মধ্যে থাকলেও থাকতে পারেন লেখক।"

দীপকাকু এর পর মাউজের সাহায্যে ক্লিক করে পার্থ রায়ের প্রোফাইলের ফোটোগুলো স্ক্রিনে এনে ফেললেন। একটা ফোটো সিলেক্ট করে ফুল স্ক্রিন করলেন। বললেন, "এই ফোটোটায় এসে আমার চোখ আটকাল। কেন বলো তো?"

প্রশ্নটা ঝিনুকের উদ্দেশে। মন দিয়ে ফোটোটা দেখছিল ঝিনুক, দোতলার বাইরের দিকে খোলা বারান্দা, সেই বারান্দাই এখন ঝিনুকের চোখের সামনে, রাস্তার ওপারে। ফোটোতে বারান্দার রেলিংয়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন দুই মহিলা। দু'জনেরই বয়স পঁয়ত্রিশের একটু কম-বেশি। একজনের পরনে হাউজকোট, অন্যজনের পোশাক বেশ আধুনিক, ট্রাউজার্স আর টপ... চোখ আটকানোর কারণ কিছুতেই খুঁজে পাচ্ছিল না ঝিনুক।

দীপকাকু ঝিনুককে বললেন, "কী, পারছ না তো? একটা ব্যাপার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আছে ছবিটায়, যার সঙ্গে কেসের ক্ষীণ রিলেশন রয়েছে।"

বাবাও খুঁটিয়ে দেখছিলেন ফোটোটা। বলে উঠেছিলেন, "আমি তো কোনও রিলেশন দেখছি না।"

দীপকাকু বলেছিলেন, "ট্রাউজার্স পরা মহিলাকে ভাল করে লক্ষ করুন। আমি কিন্তু ছবি বড় না করেই বৈশিষ্ট্যটা ধরে ফেলেছিলাম। মহিলার দাঁড়ানোর ভঙ্গি, হাসি, হেয়ারস্টাইল সব কিছুর সঙ্গে মিশে আছে অনেকদিন বিদেশে থাকার ছাপ। মডার্ন ড্রেসটাও ক্যারি করছেন। সুন্দর ভাবে। আমার মনে পড়ল পদ্মনাভবাবুর মেয়ে মহুয়ার কথা। যিনি আমেরিকার হিউস্টনে থাকেন। আমি তো অনেক ফোটোর মধ্যে ফোটোটা দেখছিলাম, কমেন্ট দেখার জন্য সিলেক্ট করলাম।"

ফুলস্ক্রিন ফোটোটাকে ঝিনুকদের কম্পিউটারে ছোট করে আনলেন দীপকাকু। কমেন্ট্স, লাইক দেখা গেল। ফোটোটা পোস্ট করে পার্থ রায় কমেন্ট দিয়েছেন, 'আমাদের বারান্দায় বিদেশি বাতাস। আমার বউ শ্রাবণী সঙ্গে ওর বন্ধু হিউস্টনের মহুয়া।' ফোটোটা পোস্ট করা হয়েছে অগস্টের কুড়ি তারিখ।"

ডেটটা পয়েন্টার দিয়ে দেখিয়ে দীপকাকু বলেছিলেন, "এর কিছুদিন আগে পদ্মনাভবাবু মারা যান। পারলৌকিক ক্রিয়ায় যোগ দিতে মেয়ে এসেছিলেন দেশে। ছবিটা পার্থ রায়ের বাড়ির বারান্দায় তোলা, ওঁর কমেন্ট থেকে সেটা পরিষ্কার। আমার প্রথমে মনে হল, উপন্যাসটা মহুয়া লিখেছেন ছদ্মনামে। কোনও উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই আছে। সম্পাদক যেহেতু চেনা, পত্রিকায় প্রকাশ করতে অসুবিধে হয়নি। একই সঙ্গে মানতে হবে, উপন্যাসটা প্রকাশ করে সম্পাদক কোনও পক্ষপাতিত্ব করেননি। যথেষ্ট বলিষ্ঠ লেখা। নিজ গুণেই সেটা প্রকাশ হওয়ার দাবি রাখে।"

দীপকাকুকে এখানে থামতে হয়েছিল মা চা নিয়ে আসার কারণে।

চা খাওয়ার মাঝে দীপকাকু ফিরে গেলেন আগের প্রসঙ্গে। বললেন, "মহুয়াকে উপন্যাসের লেখক মেনে নিতে আমার একটা কারণেই অসুবিধে হচ্ছিল, পদ্মনাভবাবুর বেডরুমের জানলার পাশে ত্রিফলা বাতির কথা লিখবেন না কেন? উপন্যাসে ল্যান্ডফোনের অবস্থান কেন পাশের ঘরে? উনি ক'মাস আগেই নিজের বাড়িতে ঘুরে গিয়েছেন। ডিটেলে এত ভুল থাকার কথা নয়। আর-একটা বড় পয়েন্ট, গোস্বামী প্রকাশনায় উনি যাননি, ততদিনে ফিরে গিয়েছেন আমেরিকায়। তা হলে কে গিয়েছিল এগ্রিমেন্টে সই করতে? কেসটা ক্রমশ জটিল আকার নিচ্ছে দেখে, ঠিক করলাম মহুয়া সম্বন্ধে ঘরে বসে অনেক তথ্য জানতে হলে ওঁর ফেসবুক অ্যাকাউন্টে যেতে হবে। ফেসবুকে পেলাম না মহুয়াকে। হয়তো অ্যাকাউন্ট নেই অথবা অন্য নামে আছে। হঠাৎ মাথায় এল, এত খাটতে যাচ্ছি কেন! শ্রাবণী রায়ের ফ্রেন্ডলিস্টে গেলেই মহুয়ার ফেসবুক অ্যাকাউন্ট পেয়ে যাব। তিনি যে নামেই থাকুন, ফোটোটা তো তাঁর থাকবে। শ্রাবণীর ফেসবুক অ্যাকাউন্ট আছে, পার্থ রায়ের ফ্রেন্ডলিস্ট থেকেই দেখে নিয়েছিলাম। শ্রাবণীর প্রোফাইলে গিয়েও মহুয়াকে পাওয়া গেল না। কিন্তু পেয়ে গেলাম এই কেসের চাবিকাঠি। শ্রাবণীর লেখালিখির ব্যাকগ্রাউন্ড আছে। ওঁর লেখা বইও বেরিয়েছে দিল্লির এক পাবলিশার্সের থেকে। তবে গল্প-উপন্যাসের নয়, প্রবন্ধের বই। ইংরেজিতে লেখেন। প্রোফাইলে বই পছন্দের যে তালিকা দিয়েছেন, বেশির ভাগ রহস্যকাহিনি। তার মানে কিছু সত্যি কথা উনি গোস্বামী প্রকাশনার অনিমেষ সোমকে বলে ফেলেছিলেন। আসলে মানুষ নিজেকে কখনওই পুরোটা আড়াল করতে পারে না, কিছু সত্যি বেরিয়েই যায়।"

কথা বলতে-বলতে দীপকাকু শ্রাবণী রায়ের অ্যাকাউন্ট খুলে ফেলেছিলেন। পয়েন্টার দিয়ে দেখালেন, "এই শ্রাবণী রায় এন জি ও-র সঙ্গে জড়িত। দুর্বল আর্থিক অবস্থার মেধাবী স্টুডেন্টদের উচ্চশিক্ষার ভার নেন ওঁরা। পদ্মনাভবাবুর ছেলে অরিন্দম নন্দী বলেছিলেন, তাঁর বোন নিয়মিত এন জি ও'তে সাহায্য করেন। তা হলে দুই বন্ধুর কমন লিঙ্ক এন জি ও-তে। দু'জনের সম্পর্কটা গাঢ় হওয়ার কথা। শ্রাবণী মহুয়ার বাড়ির অনেক কথাই জানেন, উপন্যাসটা তাঁর পক্ষে লেখা কঠিন নয়।"

বলার পর দীপকাকু শ্রাবণী রায়ের প্রোফাইলের ফোটোগুলো দেখাতে লাগলেন। কেন দেখাচ্ছেন সহজেই বোঝা গেল। বেশ কিছু ফোটোতে গাড়ির ড্রাইভিং সিটে বসে থাকতে দেখা গেল শ্রাবণী রায়কে। কখনও তিনি ড্রাইভিং সিটে বসে ফোটোগ্রাফারের উদ্দেশে হাত নাড়ছেন। ড্রাইভিংটা যে এনজয় করেন, এক্সপ্রেশন দেখেই মালুম হয়। দীপকাকু বললেন, "ধরে নিতেই পারি, ইনিই গাড়ি চালিয়ে গিয়েছিলেন গোস্বামী প্রকাশনায়। বয়স কম। গাড়ি চালাতে ভালবাসেন। ঝুঁকি নিতেই পারেন গাড়ি নিয়ে এম জি রোডে ঢোকার। শ্রাবণী রায়কে রাইটার ধরে নিয়ে আমি ওঁর একটা ফোটো প্রোফাইল থেকে নিয়ে ফোটোশপে গেলাম। মুখটা ক্লোজআপ করে সাদা বব্ড হেয়ার সেট করলাম। স্টাইলিশ ফ্রেমের চশমা দিলাম মুখে। ফোটোটা ডাউনলোড করে নিয়ে গেলাম গোস্বামী প্রকাশনায়। অনিমেষ সোমকে দেখাতেই উনি বললেন, "হ্যাঁ, ইনিই সই করে গিয়েছেন। চশমার ফ্রেমটা বোধ হয় আলাদা ছিল।"

কথা বলতে-বলতে দীপকাকু নিজের অ্যাকাউন্টে এসে ফোটোশপে বানানো শ্রাবণী রায়ের ফোটোটা দেখিয়ে বলেছিলেন, "লেখিকার কাছে এখন আমাদের অনেক কিছু জানার আছে, উৎপল হাজরাকে অপরাধী সাব্যস্ত করে কেন উপন্যাসটা লিখলেন? ছদ্মনাম ব্যবহার করলেন কেন? দুষ্প্রাপ্য ডাকটিকিটটা সত্যিই কি পদ্মনাভবাবুর কাছে ছিল? স্বাভাবিক মৃত্যুকে আপনি খুন দেখালেন কেন? এরকম আরও কিছু প্রশ্ন। কিন্তু উত্তর পেতে গেলে আমাদের এমন কিছু তথ্য প্রমাণ নিয়ে যেতে হবে, উনি যেন বলতে না পারেন আমি লেখাটা লিখিনি।"

এর পর দীপকাকু তথ্য প্রমাণ আনার দায়িত্ব ঝিনুককে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। নিজে এ কাজটা না করার কারণ হিসেবে বলেছেন, অচেনা পুরুষের চেয়ে একজন অচেনা মেয়েকে বিশ্বাস করবেন

KALYANI TECHNOLOGY ACADEMY ... 9903719159

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যে-কোনও মহিলা। ঝিনুকের সঙ্গে কথা বলতে স্বচ্ছন্দবোধ করবেন শ্রাবণী রায়। হাতের লেখার নমুনা সহজেই আনতে পারবে ঝিনুক।

দীপকাকুর দেওয়া দায়িত্ব মাথায় নিয়ে ফুটপাথে দাঁড়িয়ে আছে ঝিনুক। একঘণ্টা বোধ হয় হতে চলল, পার্থ রায় গাড়ি নিয়ে বেরলেন না। রাস্তাটা নির্জন, ঝিনুকের টানা দাঁড়িয়ে থাকাটাকে কেউ লক্ষ করছে কিনা, কে জানে। আর কতক্ষণ দাঁড়াবে দীপকাকুকে ফোন করে জিজ্ঞেস করবে কি? ভাবনা থেমে গেল।

গাড়ি চালিয়ে বেরিয়ে আসছেন পার্থ রায়। রাস্তায় এসে গাড়ি চোখের বাইরে যেতেই ঝিনুক ফুটপাত থেকে নেমে পার্থ রায়ের বাড়ির দিকে এগোয়।

দরজার ডোরবেল টিপল ঝিনুক। খানিক বাদে দরজা খুললেন শ্রাবণী রায়। বুকে ঝুলন্ত ছদ্ম আইডেন্টিটি কার্ড একটু তুলে ঝিনুক বলল, "অ্যাকোয়ানিল কোম্পানি থেকে আসছি, মার্কেট সার্ভে করতে। আপনারা কি আমাদের প্রোডাক্ট ব্যবহার করেন?"

"করি মানে! গত এক সপ্তাহ ধরে আপনাদেরই তো খুঁজে যাচ্ছি," বললেন শ্রাবণী রায়।

থতমত খেয়ে যায় ঝিনুক। ফের শ্রাবণী রায় বলতে থাকেন, "ওয়াটার ফিল্টারটা এক সপ্তাহ হল খারাপ হয়ে পড়ে আছে। কেনার সময় বলেছিল আপনাদের কোম্পানির সার্ভিস ব্যাকআপ নাকি সবচেয়ে ভাল। কিন্তু কোথায় কী। কমপ্লেন্ট নম্বরে যতবার ফোন করছি, লোক পাঠাচ্ছি, পাঠাব বলে যাচ্ছে।"

সিচুয়েশন যে দিকে টার্ন নিল, দীপকাকুর বলে দেওয়া স্ক্রিপ্ট এখানে চলবে না। ঝিনুক বুদ্ধি করে বলল, "আসলে কাস্টমার সার্ভিস তো আমার ডিপার্টমেন্ট নয়, আমি মার্কেটিংয়ে আছি। আমি আপনার কমপ্লেন কোম্পানিতে গিয়ে জানাতেই পারি। তার চেয়েও তাড়াতাড়ি কাজ হবে, আপনি যদি একটা কমপ্লেন্ট লেটার লিখে দেন। আমি সঠিক জায়গায় পৌঁছে দেব। কাস্টমারের রিটন কমপ্লেন্ট লেটার আলাদা গুরুত্ব আছে।"

হাতের লেখার নমুনা নেওয়ার জন্যই কথাটা বলল ঝিনুক। শ্রাবণী রায় বললেন, "সে আমি লিখে দিচ্ছি। তবু আপনি একবার মেশিনের প্রবলেমটা দেখে যান।"

ঘরের ভিতর দিকে হাঁটা দিলেন শ্রাবণী রায়। ঝিনুক মেশিনের কী-ই বা বোঝে! একটাই লাভ, অন্দরমহলটা পর্যবেক্ষণ করা হয়ে যাবে। তদন্তে কাজে লাগতে পারে সেটা।

দুটো ঘর পেরিয়ে ডাইনিংয়ে থামলেন শ্রাবণী রায়। দেওয়ালে লাগানো ওয়াটার পিউরিফায়ার মেশিনের সুইচ অন করলেন। মেশিনের বডিতে সুইচগুলোর পাশের রঙিন আলোগুলো শব্দসহ এক-এক করে জ্বলে উঠল। সবই তো ঠিক আছে, দেখা যাচ্ছে। কিন্তু না, যে সুইচটা টিপলে জল পড়ার কথা, শ্রাবণী রায় টিপেছেন, বেশ খানিকক্ষণ অপেক্ষার পরও এল না জল। শ্রাবণী রায় ঝিনুকের দিকে ঘুরে বললেন, "দেখলেন, কী অবস্থা!"

ঝিনুক অপরাধী মুখ করে মাথা নেড়ে সমর্থন জানাল। ভাবটা এমন, যন্ত্রটা বিকলের দায় খানিকটা তারও। কারণ, তার কোম্পানিরই তো প্রোডাক্ট। ঝিনুক বলল, "চলুন। কমপ্লেন্ট লেটার একটা লিখে দিন। দেখি, কত তাড়াতাড়ি কী করা যায়।"

প্রথম ঘরটায় চলে এসেছে ঝিনুকরা। এটা ড্রয়িংরুম। সোফায় বসে সেন্টার টেবিলে পেপার প্যাডে কমপ্লেন্ট লেটার লিখছেন শ্রাবণী রায়। ঝিনুকের আশঙ্কা ছিল, চিঠিটা হয়তো কম্পিউটারে লিখবেন। পিছনের ঘর দিয়ে আসার সময় ডেস্কটপ দেখেছে ঝিনুক। কম্পিউটারে লিখলে হাতের লেখার নমুনা হিসেবে শুধু সিগনেচার পাওয়া যেত এবং সই যদি ছোট আর জড়ানো হত, তেমন কাজে লাগত না। যদিও অন্য একটা ব্যবস্থা দীপকাকু করে দিয়েছেন। চিঠিটা লেখা হয়ে গেলে দীপকাকুর পদ্ধতিটা কাজে লাগাবে ঝিনুক।

শ্রাবণী রায় চিঠি লেখায় ব্যস্ত থাকার সুযোগে ঝিনুক ঘরের চারপাশটা ভাল করে চোখ বুলিয়ে নিচ্ছে। বইয়ের তাকে চোখ আটকাল, বেশ ক'টা নতুন বই পাশাপাশি রাখা। বাংলা বই। মনে হচ্ছে গোস্বামী প্রকাশনা থেকে কিনে আনা বইগুলোই।

"এই নিন চিঠি।"

শ্রাবণী রায়ের ডাকে সামান্য চমকে ওঠে ঝিনুক, অপ্রস্তুত বোধ করে। তার নজর যে ঘরের অন্য কিছুর প্রতি, দেখে নিলেন শ্রাবণী রায়। মনে খটকা লাগতে পারে ওঁর। ঠিক তাই, শ্রাবণী রায় জিজ্ঞেস করলেন, "কী দেখছিলেন এত মন দিয়ে?"

কমপ্লেন্ট লেটারটা শ্রাবণী রায়ের হাত থেকে নিয়ে ঝিনুক প্রশংসার গলায় বলল, "আপনি তো খুব বই পড়েন দেখছি।"

বিনয়ের মোড়কে গর্বের হাসি হাসলেন শ্রাবণী। বললেন, "শুধু আমি নই, আমার হাজব্যান্ডও পড়ে।"

দীপকাকুর দেওয়া ট্র্যাপ এবার বের করে ঝিনুক, হাতের ফাইল খুলে একটা ফর্ম তুলে এগিয়ে দেয় শ্রাবণী রায়ের দিকে। বলে, "প্লিজ, এখানে আপনার নাম, ঠিকানা, ফোন নম্বর লিখে একটা সই করে দিন। আপনাকে যে অ্যাটেন্ড করেছি, তার প্রমাণ। অফিসে গিয়ে জমা দিতে হবে।"

"কেন, কমপ্লেন্ট লেটারটাই তো প্রমাণ, আপনি এসেছিলেন আমার কাছে।"

"লেটারটা অন্য ডিপার্টমেন্টে জমা দেব। আমার ডিপার্টমেন্টের জন্য এইটা।"

"দিন," বলে ফর্মটা নিলেন শ্রাবণী। লিখতে শুরু করলেন। ঝিনুকের অপারেশন শেষের মুখে। এন্ট্রিতে যেরকম হোঁচট খেয়েছিল, ভাবতে পারেনি ব্যাপারটা এত স্মুদলি উতরোবে। ভিতর-ভিতর ভীষণ উত্তেজিত বোধ করছে ঝিনুক। ভাবছে, কতক্ষণে গিয়ে দীপকাকুকে নিজের সাফল্যটা দেখাতে পারবে... ভাবনার মাথায় বাজ পড়ল।

ফর্ম ফিলআপের শেষে শ্রাবণী রায় বললেন, "আপনি একটু বসে যান। আমার হাজব্যান্ড এক্ষুনি ফিরবে। আপনার সঙ্গে ওর একবার কথা হওয়া দরকার। ওয়াটার ফিল্টারটা নিয়ে মেজাজ খারাপ করে আছে সে। কোম্পানির প্রতিনিধির সঙ্গে সামনাসামনি কথা বললে একটু হলেও, আশ্বস্ত হবে।"

এ তো প্রায় বাঘের মুখে ঠেলে দেওয়া। ঝিনুক পার্থ রায়ের অফিসে গিয়েছিল, যদি চিনে ফেলেন। ছদ্মবেশটা তো শ্রাবণী রায়ের জন্য, হাজব্যান্ডকে কোম্পানি থেকে সার্ভে করতে আসা মেয়েটার বর্ণনা দিলে, পার্থ রায় ঝিনুকের সঙ্গে মেলাতে পারবেন না। কিন্তু নিজের চোখে দেখলে ধরে ফেলবেন। ঝিনুক এই বিপদ থেকে বেরবে কী করে? গলা শুকিয়ে গিয়েছে ঝিনুকের। শুকনো গলাতেই শ্রাবণী রায়কে বলে, "আপনার হাজব্যান্ড অফিস যাননি?"

"হাজব্যান্ড অফিস যায়, কী করে জানলেন?" ভ্রূজোড়া কাছাকাছি এনে প্রশ্ন করলেন শ্রাবণী। রহস্য গল্পের লেখকসত্তা জেগে উঠেছে।

ঝিনুক তাড়াতাড়ি ম্যানেজ দিল। বলল, "কমন ব্যাপার তো, তাই জিজ্ঞেস করলাম। কেন, ওঁর কি বিজনেস আছে?"

খানিকটা নিজেকে শোনানোর মতো করে শ্রাবণী রায় বলতে থাকলেন, "বিজনেসেও অফিস থাকে। একমাত্র স্কুল-কলেজে পড়ালে লোকে অফিস বলে না।"

কথাগুলো যেন কান পর্যন্ত পৌঁছোয়নি ঝিনুকের, এমন ভাব করে সোফা ছেড়ে উঠে পড়ল সে। বলল, "আপনি যে লেটারটা দিলেন, এতেই কাজ হয়ে যাবে। স্যারকে বুঝিয়ে বলবেন। ওঁর জন্য ওয়েট করতে হলে কোম্পানির দেওয়া টার্গেট কমপ্লিট করতে পারব না আমি। অলরেডি অনেকটা সময় বেরিয়ে গেল এখানে।"

"ওই তো এসে গিয়েছে!" দরজার দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন শ্রাবণী। আস্তেই বলেছেন কথাটা। ঝিনুক বাড়াবাড়ি রকমের চমকে উঠল।

ঘরে ঢুকে এসেছেন পার্থ রায়। ঝিনুককে দেখিয়ে শ্রাবণী হাজব্যান্ডকে বললেন, "এই তো, অ্যাকোয়ানিল থেকে মার্কেট সার্ভে করতে এসেছে। আমাদের প্রবলেমটা বললাম।"

ঝিনুককে এক পলক দেখে নিয়ে পার্থ রায় উলটো দিকের সোফায় যেতে-যেতে বললেন, "বসুন।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বসল ঝিনুক। না বসে উপায় কী। পার্থ রায় বসলেন একেবারে মুখোমুখি। এক্সপ্রেশনে বিরক্তি। বলে উঠলেন, "অদ্ভুত কোম্পানি আপনাদের। বারবার ফোন করছি। ফোনে মিষ্টি-মিষ্টি কথা, কাজের কাজ কিছু হচ্ছে না। কাঁহাতক আর জল কিনে খাওয়া যায়।" হঠাৎ থেমে গেলেন পার্থ রায়। ঝিনুকের দিকে দৃষ্টি স্থির রেখে বললেন, "আপনাকে ভীষণ চেনা-চেনা লাগছে! কোথায় দেখেছি বলুন তো?"

বুক ঢিবঢিব করতে শুরু করেছে ঝিনুকের। কোনওক্রমে বলে, "আমি তো মনে করতে পারছি না। হয়তো দেখে থাকতে পারেন আপনার কোনও পরিচিতির বাড়িতে, যেখানে সার্ভে করতে গিয়েছিলাম। অথবা রাস্তাঘাটে।"

জোরে মাথা নাড়ছেন পার্থ রায়, "না-না, অন্য কোথাও। আচ্ছা, আপনি কি অফিসে এসেছিলেন আমার কাছে লেখা জমা দিতে?"

নিজের হার্টবিট দিব্যি কানে শুনতে পাচ্ছে ঝিনুক। আপ্রাণ চেষ্টায় নিরীহ মুখ করে বিস্ময় সহকারে বলল, "আমি! লেখা। কোন অফিস আপনার?"

শ্রাবণী রায় হাজব্যান্ডকে বললেন, "সারাদিন কত লোক আসছে-যাচ্ছে তোমার কাছে, কোনও মেয়ের সঙ্গে নিশ্চয়ই ওঁকে গোলাচ্ছো।"

পার্থ রায়ের কপালে বেশ ক'টা ভাঁজ পড়ল। মাথায় আঙুল দিয়ে টোকা মারছেন আর বলছেন, "খুব রিসেন্ট ওঁকে আমি দেখেছি। আমাকে একটু টাইম দাও ভাবতে।"

ঝিনুক প্রায় মরিয়া হয়ে উঠে পড়ে সোফা ছেড়ে। বলে ওঠে, "আমার তো আর সময় নেই স্যার। আরও অনেক বাড়ি ভিজিট করতে হবে।"

মাথা নিচু করে ভেবেই যাচ্ছেন পার্থ রায়। ঝিনুক এগিয়ে যায় দরজা লক্ষ করে। রাস্তায় গিয়েই ট্যাক্সি ধরে নিতে হবে।

॥ ৫ ॥

গতকাল পার্থ রায়ের ড্রইংরুমের যে সোফাটায় বসেছিল ঝিনুক, আজ সেটাতেই বসে আছে। সময়টা দিন নয়, রাত আটটা। ঝিনুকের কোনও ছদ্মবেশ নেই আজ। স্বপরিচয়ে দীপকাকুও রয়েছেন সঙ্গে। লেখিকার সঙ্গে দেখা করার জন্য কোনও প্রমাণ দেখাতে হয়নি। পার্থ রায় দুপুর এগারোটা নাগাদ দীপকাকুকে ফোন করে দেখা করতে বলেছিলেন। ঝিনুককে মনে করতে পার্থ রায়ের গোটা একটা দিন লেগেছে। কাল উনি ছুটি নিয়েছিলেন মেয়ের স্কুলে পেরেন্টস মিটিং ছিল বলে। আজ অফিসে ভিজিটিং কার্ড রাখার জায়গায় একজনের কার্ড রাখতে গিয়ে দীপকাকুরটা চোখে পড়ে। ছবির মতো মনে পড়ে যায়, তাঁর ওই কেবিনেই এসেছিলেন দীপকাকু আর ঝিনুক। বাড়িতে আসা ঝিনুককে তখন আর মেলাতে অসুবিধে হয়নি। ডাকমাশুল সূত্রে অফিসে গোয়েন্দা হানা দেওয়ার ব্যাপারটা স্ত্রীকে ওইদিনই বাড়ি ফিরে বলেছেন, অ্যাসিস্ট্যান্টের কথাও বাদ রাখেননি। কিন্তু সহকারী যে একজন ইয়াং গার্ল বলা হয়নি সেটাই। বলা হলে কপালে দুঃখ ছিল ঝিনুকের। ধরা পড়ে যেত। যখন পার্থ রায় মনে করতে পারছিলেন না, শ্রাবণী রায় হাজব্যান্ডকে হেল্প করতেন এই বলে, "তোমার অফিসে আসা প্রাইভেট ডিটেকটিভের অ্যাসিস্ট্যান্ট নয়তো এই মেয়েটা?" তা হলেই চিত্তির।

ভাগ্যিস সে রকম কিছু হয়নি। হলে দীপকাকুকে আজ সসম্মানে বাড়িতে আমন্ত্রণ জানাতেন না পার্থ রায়। ডাকমাশুলের লেখিকা শ্রাবণী রায় এবং পার্থবাবুর সঙ্গে কথাবার্তার প্রাথমিক পর্ব শেষ হয়েছে। চা, স্ন্যাকস দিয়ে আপ্যায়নও সারা হয়েছে ইতিমধ্যে। দীপকাকু এখন দেশের রাজনৈতিক অবস্থা নিয়ে পার্থ রায়ের সঙ্গে আলোচনায় ব্যস্ত। পার্থ রায়ের অনুমতি নিয়ে র‍্যাক থেকে বই নামিয়ে পড়ায় মন দিয়েছে ঝিনুক। মন বসছে না। ভেবে যাচ্ছে তাদের এখনকার কেসটা নিয়ে।

শ্রাবণী রায় এখন পিছনের ঘরে কম্পিউটারে ব্যস্ত। স্কাইপেতে হিউস্টনের বন্ধু মহুয়া বর্মণকে ধরার চেষ্টা করছেন। দীপকাকু মহুয়া বর্মণের সঙ্গে কথা বলতে চান। বিয়ের পর পদ্মনাভবাবুর মেয়ের পদবি বর্মণ হয়েছে উৎপল হাজরার থেকে জেনেছেন দীপকাকু। গোটা নামে সার্চ দিয়েও হিউস্টনের মহুয়াকে পাওয়া যায়নি। এই কেসে মহুয়া বর্মণের সঙ্গে কথা হওয়াটা ভীষণ জরুরি। প্রয়োজনটা আরও বেশি করে দেখা দিয়েছে দীপকাকুর কাছে শ্রাবণী রায়ের বয়ানের পর। স্কাইপে কানেকশন স্লো দেখাচ্ছে, বলে গিয়েছেন শ্রাবণী। মহুয়া বর্মণকে ধরতে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

ঝিনুককে চিহ্নিত করার পর পার্থ রায় ফোন করেছিলেন দীপকাকুকে। ফোন নম্বর ছিল দীপকাকুর দিয়ে আসা ভিজিটিং কার্ডে। নিজের পরিচয় দিয়ে পার্থ বলেছিলেন, "লেখকের সন্ধান পেয়ে গেলেন তা হলে। অ্যাসিস্ট্যান্টকে পাঠিয়ে ছিলেন বাড়িতে।"

"তা পেলাম। তবে আমার কাজ সম্পূর্ণ হয়নি। ডাকমাশুল উপন্যাসটা নিয়ে আমি লেখিকার সঙ্গে কথা বলতে চাই," বলেছিলেন দীপকাকু।

পার্থ রায় বলেন, "উনি যদি কথা বলতে রাজি না হন।"

উত্তরে দীপকাকু বলেছিলেন, "তখন আমার একটাই কাজ করার থাকবে, পাবলিকলি জানিয়ে দেব রাইটারের আসল নাম।"

"উনিই যে লেখক, সে রকম নিশ্চিত প্রমাণ কি আপনার কাছে আছে?" জানতে চেয়েছিলেন পার্থ রায়।

দীপকাকু তখন প্রমাণ সংগ্রহের পর্বটা বলেছিলেন। পার্থ রায় বলতে বাধ্য হয়েছিলেন, "আপনি তো বেশ ঝানু লোক মশাই। আপনাকে দেখে কিন্তু বোঝা যায় না।"

ফোনের ওই কথোপকথনেই পার্থ রায় দীপকাকুকে আজই আসতে বলেন বাড়িতে। টাইমটাও উনিই দেন। দীপকাকু এ বাড়িতে পা রেখেই স্বামী-স্ত্রীকে বলেছেন, "আমাকে মার্জনা করবেন, আপনাদের এভাবে ব্যতিব্যস্ত করার জন্য। আমার কোনও রাইট নেই উপন্যাসটার বিষয়ে প্রশ্ন করার। তবে উত্তর দিয়ে সহযোগিতা করলে উপকৃত হব। সম্ভবত আপনারাও হবেন।"

"আমাদের কী উপকার হবে?" হাতের ইশারায় ঝিনুকদের

www.gginstitutions.org
ADMISSION OPEN
2014-15
GLOBAL GROUP OF INSTITUTIONS
Affiliated to WBUT. Govt. of W. B.
Hotel Management
BBA (Hons), BCA (Hons)
Campus: Srikrishnapur, Sutahata, Haldia, Purba Medinipur
(Near Bhagyabantapur Pool Bus Stand), West Bengal, Pin-721 635
Ph.-9434230392, 9233303993, 03224-273441

সোফায় বসতে বলে প্রশ্নটা রেখেছিলেন শ্রাবণী রায়।

ঝিনুকরা সোফায় বসার পর দীপকাকু বলেছিলেন, "উপন্যাসটা পড়ে এবং তদন্ত করতে গিয়ে আমার মনে হয়েছে আপনার অনেক সিদ্ধান্ত অনুমান নির্ভর। একটা উদ্দেশ্য নিয়ে উপন্যাসটা লেখা হয়েছে, এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত। উদ্দেশ্য যদি সৎ হয়, আমার তদন্ত তা পূরণ করবে।"

পরের প্রশ্নটা করেছিলেন পার্থ রায়, "আপনাকে এই কেসে কে অ্যাপয়েন্ট করেছে, তা কি বলা যাবে?"

"এখনই বলছি না তদন্তের স্বার্থে। পরে সবই জানতে পারবেন। তবে এটুকু বলতে পারি, যিনি তদন্ত ভার দিয়েছেন, তার হয়ে আমি এখন আর ইনভেস্টিগেট করছি না। করছি নিজের আগ্রহে। কেসটায় প্রচুর মেরিট আছে," বলেছিলেন দীপকাকু।

সোফায় নড়েচড়ে বসে পার্থ রায় বললেন, "ঠিক আছে, আপনার যা জানার আছে জিজ্ঞেস করুন। আমরা রেডি।"

দীপকাকুর প্রথম প্রশ্ন ছিল, "উপন্যাসটা কেন ছদ্মনামে লেখা হয়েছে?"

উত্তর দিতে যাচ্ছিলেন শ্রাবণী, পার্থ রায় শুরু করলেন বলতে, "ছদ্মনাম ব্যবহারের পরামর্শ আমিই দিই। প্রথম কারণ, সম্পাদকের স্ত্রীর লেখা ছাপা হলে ভাল-মন্দ বিচারের আগে পক্ষপাতিত্বের কথাটাই লোকের মাথায় আগে আসবে। যদিও আমাদের পত্রিকার পুজোসংখ্যায় লেখা মনোনয়নের জন্য তিনজন প্রতিনিধি আছেন। তাঁদের বিচারের সাপেক্ষে লেখা নির্বাচিত হয়। শেষ সিদ্ধান্ত অবশ্য সম্পাদকের। উপন্যাসটা লেখার পর শ্রাবণী আমাকে পড়িয়েছে। ভাল লেগেছে আমার। কিছু সাজেশনও দিই। ওর যে সাজেশনগুলো ঠিক মনে হয়েছে, নিয়েছে। বাকিগুলো নেয়নি। আমি ইচ্ছে করলে সরাসরি উপন্যাস ছাপতে দিতে পারতাম। দিইনি, সন্দেহ হয়েছিল, স্ত্রীর লেখা বলে ভাল লেগে যাচ্ছে না তো? লেখাটার নিরপেক্ষ বিচারের জন্য প্রতিনিধিদের কাছে পাঠিয়ে দিই ছদ্মনামে। সম্পাদকের স্ত্রীর নামে গেলে প্রতিনিধিরা প্রভাবিত হতে পারতেন।"

"উপন্যাসটা আমারও বেশ ভাল লেগেছে," বলে নিয়েছিলেন দীপকাকু। ঝিনুক নিজের ভাল লাগাটা জানানোর সুযোগ পায়নি। তার আগেই পার্থ রায় বলতে থাকলেন, "ছদ্মনাম ব্যবহারের দ্বিতীয় কারণটা হচ্ছে, অন্য নামে হলেও, উপন্যাসে এমন অনেক বাস্তব চরিত্র রয়েছে, যারা শ্রাবণীকে বিরক্ত করে মারত লেখাটা স্বনামে ছাপা হলে।"

দীপকাকু বললেন, "আর বাস্তব চরিত্রের নাম উপন্যাসে বদল করা হয়েছে মানহানির মামলার আশঙ্কায়।"

"অবশ্যই," বলে সমর্থন জানিয়ে ছিলেন পার্থ রায়।

দীপকাকু পরের প্রশ্নটা সরাসরি শ্রাবণী রায়কে করেছিলেন, "উপন্যাসটা আপনি কেন, ঠিক কী উদ্দেশ্যে লিখলেন?"

"গুছিয়ে বলতে হবে। তার আগে আপনাদের জন্য চা-টা নিয়ে আসি," বলে উঠে গিয়েছিলেন শ্রাবণী। সেই ফাঁকে পার্থ রায় জানালেন, "দীপকাকু আসছেন বলে ওঁদের মেয়েকে নাকি মামার বাড়ি রেখে আসা হয়েছে। সে নাকি এত দুষ্টু, নিশ্চিন্তে কথা বলতে দিত না।"

চা-স্ন্যাক্স নিয়ে এসে শ্রাবণী রায় উপন্যাসটা কেন লিখেছেন বলা শুরু করলেন, "মহুয়া আমার খুবই ঘনিষ্ঠ বন্ধু। স্কুল-কলেজে এক সঙ্গে পড়েছি। আমি বড় হয়েছি সেন্ট্রাল ক্যালকাটায়, ও নর্থে। বিয়ের পর মহুয়া স্টেটসে চলে গেলেও আমার সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখত। আগে চিঠি আর ফোনে, এখন মেল, চ্যাট, স্কাইপে। কলকাতায় এলেই আমার সঙ্গে দেখা করত। যদিও আসত খুবই কম। এবার বাবার মৃত্যুর খবর পেয়ে যখন এল, মন খারাপ তো ছিলই, একটু যেন ডিস্টার্বডও লাগছিল ওকে। জিজ্ঞেস করলাম কারণটা। ভেঙে বলল সব কিছুই। ওর বাবা নাকি আগেই ওকে বলে রেখেছিল, কলকাতার বাড়ির অংশ লিখে দেবেন না। কারণ, মহুয়া কোনওদিনই বসবাস করবে না এখানে এসে। বিদেশ থেকে এখানকার বাড়ির অর্ধেক বিক্রি করা মহুয়ার পক্ষে বেশ কঠিন হবে। সাহায্য লাগবে দাদার। আর যে কোনও ব্যাপারে দাদা সাহায্য করুক, এ ক্ষেত্রে করবে না। সে চাইবে না, তার এতদিনের বাসস্থানের অর্ধেকটায় বাইরের মানুষ এসে থাকুক। এইসব বিচার করে কাকাবাবু মহুয়াকে বলেছিলেন, 'আমার ডাকটিকিটের সমস্ত সংগ্রহ তোর নামে দিয়ে যাব। বিক্রি করবি, না আমার স্মৃতি হিসেবে রেখে দিবি, সে তুই বুঝবি। তবে টাকার হিসেবে সেই সম্পদ খুব কম নয়।' বাবার সিদ্ধান্তে মহুয়া কোনও বিরুদ্ধতা বা আপত্তি কোনওটাই জানায়নি।"

"কিন্তু ক্ষোভ বা অভিমান হয়েছিল কি বাবার উপর?" জানতে চেয়েছিলেন দীপকাকু।

শ্রাবণী বললেন, "তা বলতে পারি না। আগে তো কখনও এ সব নিয়ে আমায় কিছু বলেনি। এবারও বলত না, আমি জিজ্ঞেস না করলে। স্বভাবটা ওর এত ভাল, বাবা, দাদা অসম্মানিত হতে পারে, এমন কথা বন্ধু দূর অস্ত, নিজের বরকেও বলবে না। ওর মতো ঠান্ডা মাথার মেয়ের মনটা অতিরিক্ত বিষণ্ণ, বিক্ষিপ্ত করে দেওয়ার জন্য কাকাবাবুই দায়ী। মারা যাওয়ার কিছুদিন আগে ফোন করে খুব উৎসাহের সঙ্গে বলেছিলেন, 'বুঝলি মহুয়া, হঠাৎ করে এমন একটা রেয়ার স্ট্যাম্প পেয়ে গেলাম, আমার কালেকশান বিশাল দামি হয়ে গেল। আমার অবর্তমানে এটা যদি বিক্রি করিস, বাড়ি বিক্রির অর্ধেক টাকার থেকেও বেশি পাবি।'"

এখানে কথা কেটে দীপকাকু বলেছিলেন, "তাতেও কিন্তু দাদার প্রাপ্য বেশি হবে। গোটা বাড়িটা পেয়ে যাচ্ছেন। তারপর ব্যবসা। আপনি কি জানেন দোকানটা পদ্মনাভবাবু কিনে দিয়েছিলেন কি না?"

মাথা নেড়ে শ্রাবণী বলেছিলেন, "বলতে পারব না। তবে দাদার বেশি পাওয়া নিয়ে মহুয়ার মনে কোনও ক্ষোভ নেই। এবারও এসে বলেছে, আগেও বলত, দাদা-বউদিই তো বাবার দেখাশোনা করে, আমি শুধু সম্পর্কেই সন্তান। এত দূরে বিয়ে হল, বাবার জন্য কোনও কর্তব্য করতে পারি না। কালেকশানের মূল্যমান বলে কাকাবাবুই অজান্তে জটিলতা তৈরি করে ফেলেছেন। কাকাবাবুর মৃত্যুর খবরে মহুয়া প্রচণ্ড শক পায়। প্রাথমিক ধাক্কা কাটিয়ে উঠে, হিউস্টন থেকে কলকাতায় আসার পথেই প্ল্যান করে নেয়, বাবার স্ট্যাম্প অ্যালবাম বিক্রি করে কী-কী খাতে খরচ করবে। বেশির ভাগটাই অবশ্য বেরিয়ে যাবে দান-ধ্যানে। যেমন, আমাদের এন জি ও-র মাধ্যমে বাবার নামে একটা স্কলারশিপ চালু করার কথা ভাবছিল। কোনও স্ট্যাম্প মিউজিয়ামে কালেকশানগুলো দিয়ে বাবার নামে গ্যালারি করার চেয়ে সেই কাজটা মোটেই ছোট হত না।

"আরও অনেক এন জি ও, আশ্রমে স্ট্যাম্প বিক্রির টাকা ভাগ করে দেবে ভেবে রেখেছিল। স্ট্যাম্প ডিলারের থেকে মাত্র দশ লাখ পেয়ে মহুয়া পুরোপুরি হতাশ। স্বাভাবিক ভাবে আমারও খারাপ লাগছিল খুব। বন্ধুর জন্য কষ্ট তো হচ্ছিলই, আমাদের এন জি ও-র একটা বড় কাজ করার সুযোগ নষ্ট হল, স্কলারশিপ দেওয়ার ব্যবস্থাটা হল না।"

"সেই রাগে আপনি উপন্যাসটা লিখলেন পুজোসংখ্যায়। এখন সেটা বই হয়ে বেরোতে চলেছে। কাহিনিটা পড়ার স্থায়ী ব্যবস্থা। এতে কি ডাকটিকিটটা ফেরত পাওয়া যাবে?" জিজ্ঞেস করেছিলেন দীপকাকু।

শ্রাবণী রায় বললেন, "নিশ্চিত ভাবে বলা যায় না। আমার দিক থেকে যতটুকু করা সম্ভব, করেছিলাম। উপন্যাসটা লেখার আগে ডাকটিকিট নিয়ে কিছু লেখাপড়া করতে গিয়ে আমি বুঝেছিলাম, কোনও কালেক্টার যদি তাদের সার্কিটে চোর প্রতিপন্ন হয়, তার কালেকশানের দাম থাকে না। আমি উপন্যাসটা লিখে চোরাই স্ট্যাম্পটার দাম কমিয়ে দিতে চেয়েছিলাম প্রথমে। অপরাধীকে চিহ্নিত করে চাপে রেখেছি এই কারণে, ভাবমূর্তি উদ্ধারে সে গোপনে হলেও ডাকটিকিটটা যেন ফেরত দিয়ে দেয়। স্ট্যাম্পটা তখন বিক্রি করতে যেত মহুয়া অথবা দাদাকে দিয়ে করাত। সার্কিটে জানাজানি হত স্ট্যাম্প চুরি হয়নি, আইনত যে এখন মালিক, সে-ই বিক্রি করেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অপরাধী তখন বুক বাজিয়ে বলে বেড়াতে পারত, আমাকে বদনাম করার জন্যই উপন্যাসটা লেখা হয়েছে।"

"আপনাকেও তখন আর উপন্যাসটার সেকেন্ড পার্ট লিখতে হত না। যার ইঙ্গিত এই উপন্যাসের শেষে রেখে গিয়েছেন," এই কথাটা বলেছিল ঝিনুক।

শ্রাবণী রায় হেসে ফেলে বলেছিলেন, "সেকেন্ড পার্ট আদৌ লিখতাম না হয়তো। এমনকী আমার পারপাস সার্ভ হয়ে গেলে বই প্রকাশ হওয়া বন্ধ করতাম। ডাকটিকিটটা ফেরত পাওয়ার জন্য বই প্রকাশ যদি আবশ্যিক হত, অবশ্যই প্রকাশকের কাছে নিজের আসল পরিচয় দিয়ে, আগের কৃতকর্মের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতাম। কারণ, কাজটা তো এক হিসেবে বেআইনি। আমার উদ্দেশ্য জেনে প্রকাশক নিশ্চয়ই ক্ষুণ্ণ হতেন না।"

কথাবার্তা এত পর্যন্ত পৌঁছতেই উপন্যাস লেখার উদ্দেশ্য পুরোপুরি ক্লিয়ার হয়ে গিয়েছিল। তদন্তের শুরুতে দীপকাকু এরকম একটা সম্ভাবনার কথাই বলেছিলেন, "রাইটারের উদ্দেশ্য, অপরাধী উপন্যাসটার কারণে চাপে পড়ে ডাকটিকিটটা এনভেলপে পুরে কোনও ভাবে যেন পদ্মনাভবাবুর বাড়িতে পৌঁছে দেয়।" শুধু ছদ্মনাম নেওয়ার কারণ দীপকাকু তখনও পুরোপুরি বুঝে উঠতে পারছিলেন না। মানহানির মামলাটা ছাড়া পাওয়া যাচ্ছিল না আর যুক্তি। আজ প্রথমেই পার্থ রায় গোটা ব্যাপারটার ধোঁয়াশা কাটিয়ে দিলেন। অনেকক্ষণ ধরে প্রায় শ্রোতার ভূমিকায় ছিলেন দীপকাকু। এর পর থেকেই সবচেয়ে জরুরি প্রশ্নগুলো করতে শুরু করেন। প্রথম প্রশ্ন ছিল, "নির্দিষ্ট ওই ডাকটিকিটটা সত্যিই যে পদ্মনাভবাবুর কাছে ছিল, আপনি কী করে জানলেন? কল্পনা নিশ্চয়ই করেননি। কল্পনার ডাকটিকিট দিয়ে অপরাধীর উপর চাপ সৃষ্টি করা যেত না।"

"স্ট্যাম্প ডিলার শেখর সামন্ত মহুয়াকে বলেছেন, সার্ভিস লেখা গাঁধীজির ইউজড ডাকটিকিট পদ্মনাভবাবুর কালেকশানে থাকার কথা। মহুয়াকেও কাকাবাবু বলেছিলেন সদ্য দামি স্ট্যাম্প সংগ্রহ করেছেন। এর থেকেই আমরা ধরে নিলাম চুরি হয়েছে ওই স্ট্যাম্পটাই," বলেছিলেন শ্রাবণী।

দীপকাকুর পরের প্রশ্ন, "উৎপল হাজরাকেই অপরাধী সাব্যস্ত করলেন কেন? চুরি করার সুযোগ আরও অনেকেরই তো ছিল, বাড়ি অথবা বাইরের কেউ।"

উত্তরে শ্রাবণী বললেন, "একমাত্র উৎপল হাজরার সামনেই অ্যালবাম রেখে বাথরুমে বা অন্য টুকটাক কাজে উঠে যেতেন কাকাবাবু। এতটা বিশ্বাস আর কাউকে করতেন না। তাই উৎপল হাজরা ছাড়া বাইরের অন্য কারও চুরি করার সম্ভাবনা প্রথমেই উড়িয়ে দেওয়া যায়। বাড়ির লোক কাকাবাবুর অবর্তমানে আলমারি খুলে স্ট্যাম্প চুরি করতেই পারে। দেখে রেখেছে, চাবি কোথায় থাকে। সেক্ষেত্রে মহুয়ার বউদি, কাজের লোক সরলাকে সন্দেহের তালিকায় রাখা যায় না। বউদি এবং সে অত্যন্ত ঘরোয়া ধরনের। স্ট্যাম্প চুরি, বিক্রি, এসব তারা করে উঠতে পারবে না। পড়ে রইল মহুয়ার দাদা। অরিন্দমদা চুরি করলেও খুন করত না। চুরির দায়টা অনায়াসে উৎপল হাজরার ঘাড়ে চাপিয়ে দিত। কাকাবাবুকে বলত, স্ট্যাম্পের আর্থিক মূল্য উৎপল ভাল বোঝে। একমাত্র ওর সামনেই অ্যালবাম রেখে উঠে যাও তুমি। আর উৎপল চুরি করলে, খুন তাকে করতেই হবে। কাকাবাবু তাকেই ধরবেন। কারণ, সে জানে দুষ্প্রাপ্য কোনও স্ট্যাম্প সংগ্রহ করলে কাকাবাবু তাকেই প্রথমে দেখান। উৎপল তো আর জানে না ওই স্ট্যাম্পটার হিন্ট কাকাবাবু দিয়ে রাখবেন স্ট্যাম্প ডিলার শেখর সামন্তকে।"

"খুন তো উপন্যাসে হয়েছে। কাহিনি জমজমাট করতে। বাস্তবে তো স্বাভাবিক মৃত্যু," বলেছিলেন দীপকাকু।

শ্রাবণীর বক্তব্য, "স্বাভাবিক মৃত্যু নয়। কাহিনি জমানোর জন্যও খুনটা আমি লিখিনি। খুন যেভাবে করা হয়েছে, গোপন রেখেছি একটাই কারণে। অপরাধীকে মেসেজ দিতে চেয়েছি, খুন করা হয়েছে জানি। আসল পদ্ধতিটা বললাম না। ডাকটিকিট ফেরত না পেলে পরের উপন্যাসে বলব। এইটুকু স্পেস না দিলে স্ট্যাম্প কিছুতেই পাওয়া যাবে না। স্ট্যাম্পটা একবার পেয়ে গেলে যে করে হোক ওর শাস্তির ব্যবস্থা করবই।"

"এবার মৃত্যুটাকে খুন কেন বলছেন, বলুন," জানতে চেয়েছিলেন দীপকাকু।

শ্রাবণী বলেছিলেন, "আমার আর মহুয়ার দু'জনেরই মনে হয়েছে, উৎপল হাজরা কাকাবাবুর চায়ের কাপে অথবা জলের গ্লাসে এমন কোনও ওষুধ মিশিয়েছে, যা বিষের কাজ করেছে ওঁর মতো ব্লাডপ্রেশার-সুগারের পেশেন্টের উপর। যেদিন মারা গেলেন কাকাবাবু, উৎপল সকালে এসেছিল স্ট্যাম্প দেখতে। প্রত্যেকবারের মতো বাথরুমটাথরুম গিয়েছিলেন, তখনই ওষুধটা মেশানো হয়। এমনিতেই কাকাবাবুর শরীর ভাল যাচ্ছিল না। তার উপর ওই ওষুধ। সেই সপ্তাহে চেকআপ করতে এসে ব্লাডপ্রেশার বেশি দেখেছিল ওষুধের দোকানের ছেলেটা।"

"শুনতে বিশ্বাসযোগ্য লাগলেও খুন প্রমাণ করা বেশ কঠিন," বলে নিয়ে দীপকাকু প্রশ্ন করেছিলেন, "আপনি পদ্মনাভবাবুর শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে যাননি, তাই না?"

"না, যাইনি। কী করে জানলেন?" বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন শ্রাবণী।

দীপকাকু বলেছিলেন, "শুধু ওইদিন নয়, বহু বছর ও বাড়িতে আপনি যাননি। তাই পরিবেশ বর্ণনার ডিটেলে দুটো খামতি রয়ে গিয়েছে, এক পদ্মনাভবাবুর বেডরুম লাগোয়া রাস্তায় ত্রিফলা বাতি বসেছে। দূরের ল্যাম্পপোস্টের ম্লান আলো তাতে মিশে যায়। আর ল্যান্ডফোনটা এখন নীচে, অরিন্দমবাবুর ঘরে থাকে। এই দুটো ফল্টের কারণে আপনার কাছে পৌঁছতে সুবিধে হয়েছে। প্রথমেই বুঝে নিয়েছিলাম। সম্প্রতি ও বাড়ির সঙ্গে রাইটারের যোগাযোগ ছিল না। আর একটা ভুল আপনি করেছেন, সরকারি কাজে ব্যবহৃত ওই স্ট্যাম্প উইথ এনভেলপ ডেড লেটার অফিসে যাওয়ার কথা নয়। তার থেকে আমার মনে হয়েছিল স্ট্যাম্প সার্কিটের বাইরের কেউ এটা লিখেছেন।"

প্রত্যাশিত ভাবেই দীপকাকুর বুদ্ধিমত্তায় আশ্চর্য হয়েছিলেন

AMARBOI.COM

গৃহ শিক্ষার আদি ও অকৃত্রিম পথিকৃৎ

শিক্ষনী

যে কোন জায়গায়, যে কোন শিক্ষা স্তরে, যে কোন সাবজেক্ট-এর জন্য শিক্ষনী অভিজ্ঞ, কনভেন্ট এডুকেটেড গৃহশিক্ষকের ব্যবস্থা করে

Kolkata Office:
8/29 Fern Road, 2nd Floor, Gariahat
Kolkata -19, Ph: 2460-3741 / 0849
Howrah Office:
128/1/1 Tripura Roy Lane
Salkia Howrah-6
Ph: 2675-0208 / 4247

Enrolment open for qualified, convent educated home tutors: 26757433

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রায়দম্পতি। শ্রাবণী বললেন, "শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে যেতে আমার ভাল লাগে না। এক্ষেত্রে হয়তো যেতে হত। কিন্তু মহুয়াই এসে পৌঁছল ওইদিন দুপুরে। আর মহুয়া থাকে না বলে ও বাড়ি আমার যাওয়া হয় না। এক সময় ওদের বাড়িতে খুব যেতাম। ডেড লেটার অফিসের কথাটা কোথাও পড়েছিলাম, ওই অংশটা বানিয়েছি।"

এর পরই দীপকাকু বলেছিলেন, "আপনার সঙ্গে কথা বলার পরও কিছু প্রশ্ন আমার রয়ে যাচ্ছে মহুয়ার জন্য। যার উত্তর আপনি নির্দিষ্ট ভাবে দিতে পারবেন না। এখনই কি ওঁর সঙ্গে চ্যাট করার ব্যবস্থা করে দিতে পারবেন?"

"চ্যাট কেন, দাঁড়ান স্কাইপেতে এনে দিচ্ছি ওকে," বলে সেই যে শ্রাবণী পাশের ঘরে গিয়েছেন, এখনও তো পেলেন না মহুয়াকে। দীপকাকু এখন টপিক চেঞ্জ করে ভারতের ক্রিকেটদল নিয়ে মেজাজে আড্ডা মারছেন পার্থ রায়ের সঙ্গে। ওঁকে দেখে এখন মনে হচ্ছে, যেন ভুলেই গিয়েছেন এ বাড়িতে কী কারণে এসেছেন।

"পেয়েছি! পেয়েছি। চলে আসুন," পিছনের ঘর থেকে ভেসে এল শ্রাবণী রায়ের গলা। 'পেয়েছি' কথাটা অনেকটা 'ইউরেকা'র মতো শোনাল।

পিছনের ঘরের কম্পিউটার স্ক্রিনের সামনে বসেছেন দীপকাকু। ইন্টারনেট স্লো থাকার কারণে মহুয়া বর্মণের ছবি একটু অস্পষ্ট আসছে। দীপকাকুর ইন্ট্রোডাকশন দিয়ে রেখেছেন শ্রাবণী। নমস্কার বিনিময় করে দীপকাকু বললেন, "আপনাকে খুব বেশি বিরক্ত করব না। কানেকশানও ভাল নেই। যখন-তখন লিঙ্ক ফেল করতে পারে। তাড়াতাড়ি ক'টা প্রশ্ন করে নিই। এক, আপনার দাদার দোকানের জন্য কি বাবা টাকা দিয়েছিলেন?"

"হ্যাঁ দিয়েছিলেন। বাবা বলেছিল, দাদা সে টাকা শোধ করে দিয়েছে। আমি বিশ্বাস করি না।"

"আপনার দাদা বাড়ি-দোকান সব পেল। আপনি স্ট্যাম্প বিক্রির সামান্য টাকা, মনে হয় না বঞ্চিত হয়েছেন?"

"মনে হত না, যদি স্ট্যাম্পটা পেতাম। বাবা তো আমার জন্য ওইটুকুই বরাদ্দ করে গিয়েছিল।"

"আচ্ছা, স্ট্যাম্প ডিলার শেখর সামন্তর সঙ্গে ওই দামি ডাকটিকিটটা নিয়ে আপনার সঙ্গে এগজ্যাক্টলি কী কথা হয়েছিল? আপনার দাদা কি তখন সেখানে ছিলেন?"

"দাদা ছিল সঙ্গে। বাবার লিখে রাখা এক হাজার থেকে বেশি দামি ডাকটিকিটের লিস্টটা দেখে শেখরবাবু অবাক হয়ে বলেছিলেন, 'সার্ভিস লেখা গাঁধীজির স্ট্যাম্প উইথ এনভেলপ তো নেই দেখছি! আলাদা সরিয়ে রাখেননি তো? ওটা থাকলে গোটা কালেকশানের যা দাম পাচ্ছেন, তার দ্বিগুণেরও বেশি পেতেন।' দাদা তখন জিজ্ঞেস করে, 'ওই স্ট্যাম্প কি থাকার কথা ছিল বাবার কাছে?' শেখরবাবু বলেছিলেন, 'আমি তো ভেবেছিলাম শিওর আছে। গত আট তারিখে আমায় ফোন করে জিজ্ঞেস করেছিলেন, ওই স্ট্যাম্পের দাম কত এখন বাজারে? স্ট্যাম্পের দাম উনি আমার চেয়েও ভাল জানেন। বুঝতে পেরেছিলাম, যাচাই করে নিচ্ছেন। দামটা বলে জানতে চেয়েছিলাম, পেয়েছেন নাকি স্ট্যাম্পটা? কথা এড়িয়ে গিয়ে বললেন, পেলে তোমাকে তো দেখাবই। এক দিন সময় করে এসো বাড়িতে। যাওয়া হল না। উনি চলে গেলেন বড্ড তাড়াতাড়ি।"'

এত দূর বলে থামলেন স্কাইপে থাকা মহুয়া। ফের বলে উঠলেন, "নাইন্থ অগস্ট বাবা আমাকে ফোন করে বলেন, রেয়ার ডাকটিকিট পেয়েছেন। যা বিশাল দামি। ডিলারের কাছ থেকে কনফার্ম হয়ে সুখবরটা আমায় দিয়েছিলেন। স্ট্যাম্পের ডিটেলস দেননি, কারণ ওটা আমার সাবজেক্ট নয়। স্ট্যাম্পের কিছুই বুঝি না আমি।"

"থ্যাঙ্ক ইউ। আপনার ইনফরমেশন খুবই কাজে লাগবে আমার।"

দীপকাকু থামতেই কম্পিউটার স্ক্রিনের মহুয়া বলে উঠলেন, "কী মনে হচ্ছে, পাওয়া যাবে ডাকটিকিটটা?"

"খামের সঙ্গে থাকলেও জিনিসটা তো খুব পাতলা, ছোট, খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। একটাই ভরসা, ওটার দাম। বিশাল দামের কারণেই মার্কেটে ভেসে উঠবে স্ট্যাম্পটা। এখন হোপ ফর দ্য বেস্ট," বললেন দীপকাকু।

ঝিনুক আশ্বস্ত হল এই ভেবে, এই কেসে ডাকটিকিটটার অস্তিত্ব তার মানে আছে। হারিয়ে যায়নি সেটা।

॥ ৬ ॥

পরের দিন দুপুর দুটো। ঝিনুক দাঁড়িয়ে আছে অরিন্দম নন্দীর বাড়ির থেকে একটু দূরে, শেড দেওয়া বাসস্টপে। আজও দীপকাকু একলা একটা কাজে পাঠিয়েছেন। তবে আগের বারের মতো ছদ্মবেশ নিতে হয়নি। দীপকাকু গিয়েছেন স্ট্যাম্প ডিলার শেখর সামন্তর সঙ্গে দেখা করতে। ঝিনুকও যেতে চেয়েছিল, এই কেসে স্ট্যাম্প ডিলার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছেন। নিয়ে না যাওয়ার কারণ হিসেবে দীপকাকু বলেছেন, "সঠিক সময়ে নির্দিষ্ট মানুষকে ইন্টারোগেট না করা হলে তদন্তে সাফল্য আসে না।" শেখর সামন্ত দীপকাকুকে আজ দুপুরবেলা অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিয়েছেন। আর দীপকাকুর মনে হয়েছে, আজই অরিন্দম নন্দীর কাজের লোক সরলার কাছ থেকে কিছু ইনফরমেশন নেওয়া দরকার। দীপকাকু খবর নিয়ে জেনেছেন, সরলামাসি দুটো নাগাদ এই স্টপ থেকে বাসে উঠে মানিকতলায় নিজের সংসারে যায়। ঘন্টাচারেক পর ফিরে আসে। আবার রাতে বাড়ি যায়। ওকে ধরার সঠিক সময় এটাই, বাসস্টপ ফাঁকা থাকে, নির্ঝঞ্ঝাটে কথা বলা যাবে কিছুক্ষণ। কী-কী পয়েন্ট জিজ্ঞেস করতে হবে বলে দিয়েছেন দীপকাকু।

তদন্ত এখন কোন পর্যায়ে আছে, ঝিনুক কিছুই বুঝতে পারছে না। পদ্মনাভবাবুর বাড়ির লোক, বাইরের চেনা-পরিচিতদের সকলকেই দীপকাকু সন্দেহের তালিকায় রেখেছেন। এমনকী, মহুয়া, শ্রাবণী রায়কেও বাদ রাখেননি। কেস নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল আজ সকালে ঝিনুকদের বাড়িতে। দুই বন্ধুর নাম শুনে বাবা দীপকাকুকে বলেছিলেন, "তুমি ওদের কী মনে করে সন্দেহের তালিকায় রাখছ?"

দীপকাকু বলেছিলেন, "হতে পারে পদ্মনাভবাবু ফোনে মেয়েকে শুধু দুর্মূল্য স্ট্যাম্পটার কথা বলেননি, স্ট্যাম্পটা কেমন দেখতে সেটাও বলেছিলেন। মহুয়া হিউস্টন থেকে বাড়ি এসে প্রথমেই বাবার কালেকশন ঘেঁটে ওই স্ট্যাম্পটা সরিয়ে নেন। তারপর বিক্রি করতে যাওয়া হয় স্ট্যাম্প ডিলারের কাছে। সঙ্গে দাদা অরিন্দম নন্দী ছিলেন। দেখলেন, বোন তাঁর তুলনায় অনেক কম টাকা পাচ্ছে। মহুয়ার উদ্দেশ্য ছিল, দাদা এই ঘটনায় দয়াপরবশ হয়ে বোনকে নিজের থেকে কিছু টাকা অফার করবে।

"তখন নিজের কৃতকর্ম আড়াল করতে মহুয়া বন্ধু শ্রাবণীকে দিয়ে উপন্যাসটা লেখান। দোষী সাব্যস্ত করা হয় বেচারা উৎপল হাজরাকে। যাতে দাদা তো বটেই, আর কেউ যেন না মনে করে ডাকটিকিটটা মহুয়ার কাছেই আছে।"

বাবা বলেছিলেন, "এটা করে লাভ কী হল ওদের? বাজারে স্ট্যাম্পটার দাম তো কমে গেল।"

"উপন্যাসটার কারণে কলকাতার সার্কিটে কিংবা ধরে নিলাম সারা ভারতে দাম কমলেও, আমেরিকার মার্কেটে তো কমবে না। আপনি খেয়াল করছেন না, মহুয়া আমেরিকায় থাকে। ওখানে বিক্রি করে দেবে স্ট্যাম্পটা," বলেছিলেন দীপকাকু।

বাবা তো পুরো থ। প্যাঁচ শুনে ঝিনুকের মাথাও পুরো ঘেঁটে গিয়েছে। এত জটিল ভাবে দীপকাকু যেমন ভাবতে পারেন, তেমনি ওই গোলকধাঁধা থেকে সত্যকে আবিষ্কার করতেও অসুবিধে হয় না। ভাবনার মধ্যেই ঝিনুক দেখতে পেল সরলামাসি তড়িঘড়ি পায়ে রাস্তা পার হয়ে বাসস্টপের দিকে আসছে। কাজের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করে নেয় ঝিনুক। বাসস্টপে এখন সে ছাড়া একজন বৃদ্ধ। তিনিও তাঁর গন্তব্যের বাস এলে এক্ষুনি উঠে যাবেন।

সরলামাসি এসে দাঁড়াল স্টপে। ঝিনুক এগিয়ে গিয়ে হাসিমুখে বলল, "চিনতে পারছেন?"

"কেন চিনব না। তুমি তো ডিটেকটিভবাবুর অ্যাসিস্ট্যান্ট।"

হকচকিয়ে গেল ঝিনুক, সরলামাসির মুখে নিজের এরকম কেতাবি

পরিচয় পাবে আশা করেনি। জিজ্ঞেস করেই ফেলে, "আমার কাজটা আপনি জানলেন কী করে?"

"কেন জানব না। তোমরা সেদিন বাড়ি থেকে চলে যাওয়ার পর দাদাবাবু তো বউদিকে তোমার কথা বলছিল, ওইটুকুন মেয়ে, এখনও হয়তো কলেজ শেষ হয়নি। কোথায় মন দিয়ে লেখাপড়া করবে, তা নয় রোজগারের জন্য ডিটেকটিভের অ্যাসিস্ট্যান্টের কাজ করছে।"

'রোজগার' কথাটা শুনে আর একটু হলে হেসে ফেলত ঝিনুক, কোনওক্রমে সামলে নিয়ে বলল, "ওই ডিটেকটিভবাবুই আমাকে পাঠিয়েছেন তোমার থেকে কিছু কথা জানতে।"

"বলো, কী জানতে চাও?"

"যেদিন পদ্মনাভবাবু মারা গেলেন, সকালের জলখাবার কি উৎপলবাবুর সঙ্গে খেয়েছিলেন?"

"হ্যাঁ। উৎপলদা এলে সকালবেলাতেই আসেন। বড়বাবুর সঙ্গে ওঁকেও জলখাবার দেওয়া হয়।"

"উৎপলবাবু চলে যাওয়ার পর বড়বাবুর শরীর খারাপের মতো কিছু হয়েছিল? ধরো, মাথা ঘোরা, বমি..."

"কিচ্ছু না। তবে সকাল থেকে বড়বাবুর মেজাজ খুব খারাপ ছিল। সকালে উৎপলবাবু যখন এলেন, আমি দরজা খুলে দিয়ে উপরে এসে বড়বাবুকে খবর দিলাম। উনি বললেন, 'বলে দে, আমি বাড়ি নেই।' আমি বললাম, 'আপনি আছেন বলে ফেলেছি।' বসে আছেন নীচের ঘরে। উনি বললেন, 'কী আর করবি, পাঠিয়ে দে উপরে।'"

"বড়বাবু মারা যাওয়ার পর তোমার দাদাবাবুকে কি বাবার শোওয়ার ঘরে কিছু খোঁজাখুঁজি করতে দেখেছ তুমি?"

"খোঁজাখুঁজি করছেন কিনা জানি না। ঘরটা ভাল করে ধোলাই পরিষ্কার করা হয়েছে। আমাকে দিয়ে নয়, দোকানের কাজের লোককে দিয়ে।"

"দিদি, পদ্মনাভবাবুর মেয়ে এখানে আসার পর বাবার দেরাজ আলমারি ঘাঁটাঘাঁটি করছিল কি?"

"শ্রাদ্ধের দিন কিছু করতে পারেনি। কাজ হচ্ছিল ও ঘরে। দু'দিন যেতে আলমারি থেকে বড়বাবুর ডাকটিকিটের অ্যালবামগুলো বের করেছিল দিদি আর বউদিদি মিলে।"

"প্রেশার, সুগার চেক করতে এসে ভদ্রলোক যে বলে গেলেন, প্রেশার বেশি। ডাক্তার দেখাতে হবে। ডাক্তার দেখানো হয়নি কেন? পদ্মনাভবাবু নিজেই চাননি, নাকি গা করেনি বাড়ির লোক?"

"বড়বাবু নিজেই চাননি ডাক্তার দেখাতে। সেদিন সকালে আমরা সকলেই ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। নবারুণদা সকালে দু'বার করে প্রেশার মাপল। বড়বাবুকে বলল, 'প্রেশার খুব হাই। সুগারের রিপোর্ট সন্ধেবেলা পাওয়া যাবে। আপনি আপাতত উপরে গিয়ে শুয়ে পড়ুন। আজই একবার ডাক্তার দেখিয়ে নেবেন।' বড়বাবু নিজের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়লেন। ঘণ্টাদু'য়েক বাদে নবারুণদা আবার এসেছিল বড়বাবুর শরীরের খোঁজ নিতে। উপর থেকে ঘুরে এসে বউদিদিকে বলল, 'এখন তো ঘুমোচ্ছেন। লক্ষণ ভালই। তবু সুগারের রিপোর্টটা নিয়ে ডাক্তারকে একবার দেখিয়ে নিন।' ঘুম থেকে উঠে বড়বাবু বললেন, 'শরীর এখন একদম ফিট। ডাক্তার দেখানোর কোনও দরকার নেই।' সন্ধেবেলা সুগারের রিপোর্টে খারাপ কিছু পাওয়া গেল না। বউদিদি তবু শ্বশুরমশাইকে বলেছিলেন, 'ডাক্তার একবার দেখিয়ে নিলে ক্ষতি কী? সকালে প্রেশারটা হঠাৎ বেড়ে গেল'। কথা কানেই নেননি বড়বাবু।"

ঝিনুক পরের প্রশ্নে যাবে, সামনে এসে উদয় হল মস্তান গোছের একজন। বয়স পঁচিশ-ছাব্বিশ। তেরিয়া ভঙ্গিতে ঝিনুককে বলল, "কী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্যাপার, আমাদের পাড়ার কাজের লোককে কী ফুসমন্তর দেওয়া হচ্ছে শুনি?"

ঝিনুক তো প্রথমটায় হতভম্ব। লোকটার প্রশ্নে মাথাটা গরম হয়েছে। ঝাঁঝের সঙ্গে সে বলে ওঠে, "কী কথা হচ্ছে আপনাকে বলতে যাব কেন?"

"বলতে বাধ্য। পাড়ার বড়লোক বাড়িতে কাজ করে বউটা, তাকে প্ল্যান দেওয়া হচ্ছে কীভাবে চুরি করবে ও বাড়ি থেকে!"

অপমানে কথা হারিয়ে ফেলেছে ঝিনুক। অনেক চেষ্টায় বলে ওঠে, "আপনার এত সাহস হচ্ছে কী করে, আমাকে এ সব কথা বলার!"

"আরও সাহস দেখাবে?" বলে লোকটা ফট করে ঝিনুকের হাত থেকে মোবাইল ফোনটা নিয়ে নিল। শাসানির গলায় বলে উঠল, "বলো, তাড়াতাড়ি বলো, কী কথা হচ্ছিল?"

কারাটেবিদ্যা ঝিনুকের হাতের তালুকে ততক্ষণ স্টিফ করে দিয়েছে। তালুর ধারটা সজোরে চপারের মতো বসিয়ে দিল লোকটার মোবাইল ধরা কবজির উপর। ছিটকে গেল ফোনসেট। লোকটার লেগেছে ভালই, আঘাত লাগা হাতটাকে ধরে বসে পড়েছে ফুটপাথে। ঝিনুক নিজের মোবাইলটা কুড়িয়ে নিতে যায়। দেখে, হাত ধরা অবস্থাতেই এগিয়ে আসছে মস্তানটা। একটু নার্ভাস লাগে ঝিনুকের, অনেকদিন প্র্যাকটিসে যাওয়া হয়নি, কিকটা ঠিকঠাক চালাতে পারবে তো? ভাবনার মধ্যেই চালিয়ে দিয়েছে ঝিনুক। অব্যর্থ নিশানায়, মস্তানের ডানগালে ঝিনুকের বাঁপায়ের ফুল পাওয়ার কিক আছড়ে পড়েছে। মস্তান এখন ফুটচারেক দূরে ধুলোয় গড়াগড়ি। সরলামাসিকে আশপাশে দেখা যাচ্ছে না। ভয়ে সরে পড়েছে। সেটাই স্বাভাবিক। ঝিনুক মোবাইলটা জিন্সের পকেটে পুরতে যাবে, ওমা, লোকটা আবার এগিয়ে আসছে। এ তো মহা ফ্যাচাংয়ে পড়া গেল! রাস্তায় দাঁড়িয়ে এখন মারপিট করে যেতে হবে নাকি?

করতে হল না। একজন এসে বুকে ধাক্কা মারলেন লোকটার। যিনি মারলেন, চিনতে পারল ঝিনুক, নবারুণবাবু। বাসস্টপের একটু তফাতে মেডিকেল শপে কাজ করেন। পদ্মনাভবাবুর প্রেশার, সুগার ইনিই মাপতেন। শুধু বুকে ধাক্কা নয়, লোকটাকে সপাটে একটা চড়ও কষালেন। মুখেও কিছু বললেন, 'যা ভাগ' কথাটাই শুধু ঠিকঠাক কানে এল ঝিনুকের। ল্যাংচাতে-ল্যাংচাতে চলে গেল লোকটা। নবারুণবাবু এবার এগিয়ে এলেন ঝিনুকের কাছে। জিজ্ঞেস করলেন, "কী হয়েছিল, তুমি তো একাই ভাল ধোলাই দিলে দেখলাম!"

"আর বলবেন না, যা-তা কথা বলছিল। মোবাইলটা কেড়ে নিল।"

"বুঝেছি, মোবাইল ছিনতাই করতেই এসেছিল। ইদানীং ওদের দৌরাত্ম্য খুব বেড়েছে, তোমার চোটটোট লাগেনি তো?"

"নাঃ, আই অ্যাম ওকে," বলল ঝিনুক।

"দাঁড়াও, তোমার জন্য একটা ট্যাক্সি ডেকে দিই," বলে নবারুণ হাতের ইশারায় দূরে ফুটপাথ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকা একটা ট্যাক্সিকে ডাকলেন।

ট্যাক্সিটা এগিয়ে আসছে। নবারুণবাবু ঝিনুককে বললেন, "তোমাদের কেসের কত দূর?"

"এগোচ্ছে," ছোট্ট করে উত্তর সারল ঝিনুক।

"কেস অরিন্দমদার দোকান না বাড়ি সংক্রান্ত, উনি তো সেদিন কিছুই বললেন না।"

দীপকাকুর বদলে এবার ঝিনুকের কাছ থেকে কেসের ব্যাপারটা জানতে চাইলেন নবারুণ। সদ্য উপকার করেছেন, সামান্য হলেও জানার অধিকার তৈরি হয়েছে। দীপকাকুর পারমিশন ছাড়া ঝিনুক মোটেই কিছু বলবে না। মুখে একটা রহস্যের হাসি ধরে রেখেছে। ট্যাক্সি পাশে দাঁড়াতেই উঠে পড়ে ঝিনুক। ভদ্রলোককে ধন্যবাদটুকু জানানো হল না। ট্যাক্সি এগিয়ে চলল।

॥ ৭ ॥

আজ সম্ভবত ধরা পড়তে চলেছে অপরাধী। সম্ভবত এই কারণে, দীপকাকু অপরাধীকে ধরার জন্য ফাঁদ পেতেছেন, ধরা যে সে আজ দেবেই, কোনও গ্যারান্টি নেই।

অপরাধীর জন্য জাল পাতা হয়েছে স্ট্যাম্প ডিলার শেখর সামন্তর বাড়িতে। শেখরবাবু বসে আছেন বাড়ির সামনে অফিসঘরটায়। ওঁর মূল বিজনেস বিল্ডিং মেটিরিয়ালের, স্ট্যাম্পেরটা সাইড বিজনেস। খানিকক্ষণের মধ্যেই দুষ্কৃতকারী অফিসঘরে আসবে, পদ্মনাভবাবুর থেকে চুরি করা স্ট্যাম্পটা বিক্রি করতে। অফিসঘরের পিছনে ড্রইংরুমে বসে থাকা দীপকাকু উঠে গিয়ে হাতেনাতে ধরবেন অপরাধীকে। ড্রইংরুমে দীপকাকু ছাড়াও তিনজন। ঝিনুক, বাবা, আর একজন, যাঁর সঙ্গে দীপকাকু এখনও আলাপ করাননি। উনি এসেছেন ঝিনুকদের একটু পরে। আলাপ না করানোর কারণ, এ ঘরে কথা বলা যাবে না, দীপকাকু আগেই বলে রেখেছেন। ফোনও সাইলেন্ট মোডে রাখতে হয়েছে সকলকে। অপরিচিত ভদ্রলোক ঘরে ঢুকতেই দীপকাকু ইশারায় ফোনের কথা মনে করিয়ে দিয়েছিলেন। উনি মাথা নেড়ে জানিয়েছেন নির্দেশমতো ফোন ওই মোডেই আছে।

ভদ্রলোক একেবারেই গোবেচারা গোছের। মানুষটির পরিচয় নিয়ে ঝিনুক মোটেই তেমন কৌতূহলী নয়। কারণ, এর চেয়েও বড় সাসপেন্স দীপকাকু ক্রিয়েট করে রেখেছেন। অপরাধীর নাম এখনও পর্যন্ত বলেননি। সে পুরুষ না মহিলা, স্ট্যাম্প ফেরত না দিতে আসা পর্যন্ত জানা যাবে না।

সরলামাসির দেওয়া ইনফরমেশন এবং সেদিনের মারপিটের ঘটনা দীপকাকুকে ফোনে জানিয়ে ছিল ঝিনুক। পরের দু'দিন দীপকাকুর পাত্তা পাওয়া যায়নি। কেসের অগ্রগতি জানার জন্য বাবা ফোন করেছিলেন দু'বার, ধরেননি দীপকাকু। এটা হচ্ছে কেস সলভ হয়ে আসার সাইন। বাবা ঝিনুককে বলেছিলেন, "দেখবি, আজকালের মধ্যেই দীপঙ্কর অপরাধীকে ধরে ফেলবে।"

ঠিক তাই। দীপকাকু আজ সকাল ন'টা নাগাদ বাবাকে ফোন করে বললেন, "আজ অফিস ডুব মেরে দিন রজতদা। আমাদের সঙ্গে চলুন। মনে হচ্ছে স্ট্যাম্পটা সমেত চোরকে আজ ধরতে পারব।"

বাবা তো মহা খুশি। বাবার গাড়িতেই তারাতলায় শেখর সামন্তর বাড়িতে আসা হয়েছে। বাড়ির অনেক আগেই ড্রাইভার আশুদাকে বলে গাড়ি থামিয়েছেন দীপকাকু। আশুদাকে আর-একটা ডিউটিও দিয়েছেন। শেখর সামন্তর বাড়ি দেখিয়ে বলেছেন, "ও বাড়ি থেকে কাউকে যদি ছুটে পালিয়ে যেতে দ্যাখো, দৌড়ে গিয়ে ধরবে।"

ঝিনুক জানে আশুদা এখন টানটান উত্তেজনায় বাইকে অপেক্ষা করছে। তদন্তের কাজে আশুদার বিরাট উৎসাহ। এ বাড়িতে ঢোকার মুখে বাবা শু খুলতে যাচ্ছিলেন, দীপকাকু বললেন, "পরেই চলে আসুন। বাইরে বেশি জুতো দেখলে বিপদের গন্ধ পাবে অপরাধী।" ঝিনুক বুঝতে পেরেছিল একই কারণে গাড়িটা দূরে রাখা হয়েছে। অপরিচিত ভদ্রলোকও জুতো পরেই ঢুকেছেন ঘরে। নির্দেশ নিশ্চয়ই আগেই দিয়ে রেখেছিলেন দীপকাকু। আধঘণ্টা হতে চলল ঝিনুকরা এসেছে। বাবা একটু উসখুস করছেন। কৌতূহল চেপে রাখতে পারছেন না। এখানে আসার পথে বাবা বারবার সামনের সিটে বসে থাকা দীপকাকুকে বলে গিয়েছেন, "অপরাধীর নামটা কি একেবারেই বলা যাবে না? নামের আদ্যাক্ষরটা অন্তত বলো।"

দীপকাকু একবার শুধু বলেছেন, "এটুকু সারপ্রাইজ হিসেবে থাক না।"

বাবার পরের উপরোধগুলোয় দীপকাকু টুঁ শব্দটি করেননি। এই মুহূর্তে বাবার ধৈর্যের বাঁধ ভাঙল। বলে উঠলেন, "আমরা কি বড্ড তাড়াতাড়ি এসে পড়েছি?"

ঠোঁটে আঙুল দিয়ে দীপকাকু চুপ করতে নির্দেশ দিলেন। ঠিক তখনই বাড়ির ডোরবেলটা বেজে উঠল। ঝিনুকের কানে আওয়াজটা বাজল সাইরেনের মতো। দীপকাকু সোফা ছেড়ে ছিটকে উঠে গিয়েছেন অফিসঘরের দরজার পাশে। দুটো ঘরের মাঝে ঝুলছে পরদা। ঝিনুকরা একে-একে এসে দীপকাকুর পাশে দাঁড়ায়। পরদার সামনে দাঁড়ানো চলবে না, পা দেখা যাবে নীচ দিয়ে। সামনের ঘরের কথা ভেসে আসছে। অপরাধী বলছে, "দামটা বড্ড কম হয়ে যাচ্ছে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দাদা, আর লাখ দু'য়েক বাড়ান..."

পুরুষকণ্ঠ। গলাটা ভীষণ চেনা-চেনা ঠেকছে ঝিনুকের, আর দু'-একটা কথা শুনলেই চিনে ফেলবে। শেখর সামন্ত বলছেন, "জিনিসটা তো চোরাই। আমি যে কিনছি, জানবে, বিরাট ভাগ্য তোমার। বেচতে না চাও, চলে যাও। ধরা তুমি পড়বেই।"

"চুরি হলেও, সেটা অনেক বুদ্ধি খরচ করে করতে হয়েছে। তার দামটাই তো পাচ্ছি না," বলল অপরাধী।

গলাটা এবার চিনে ফেলেছে ঝিনুক। দীপকাকু পরদা সরিয়ে অফিস ঘরে ঢুকলেন। বললেন, "বুদ্ধিটা ভাল কাজে লাগালে নিশ্চয়ই দাম পেতে।"

"আপনি এখানে," বলে চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়েছে মেডিকেল শপের নবারুণ। হাজার অনুমান করেও ঝিনুক এঁকে অপরাধী হিসেবে চিহ্নিত করতে পারত না। একটু আগে গলা চিনে ভীষণ অবাক হয়েছে সে। দীপকাকুর পাশ থেকে এবার সেই অপরিচিত ভদ্রলোক অপরাধীর উদ্দেশে বলে উঠলেন, "ছিঃ, নবারুণ তুমি এটা কী করলে! ওঁর মতো একজন ভদ্রলোককে এভাবে ঠকালে! উনি তো বাবার জমানো ব্যক্তিগত চিঠিপত্রগুলোর খাম-পোস্টকার্ড উলটেও দেখেননি। বলেছিলেন, 'এগুলো ফেলে দেবেন কেন, আমায় দিয়ে দিন। পুরনো দিনের চিঠিপত্র তো ভাল কোনও স্ট্যাম্প পেয়ে গেলেও পেয়ে যেতে পারি'। আমি যা দাম চাইলাম, এক কথায় দিয়ে দিলেন।"

কথার খেই ধরে এবার দীপকাকু বলতে থাকলেন, "সৌভাগ্যবশত দামি স্ট্যাম্পটা পদ্মনাভবাবুর কাছে চলে গেলেও, ডাকটিকিট নিয়ে ওঁর বিপুল লেখাপড়া না থাকলে স্ট্যাম্পটার মূল্য বুঝতে পারতেন না। স্ট্যাম্পটার আর্থিক মূল্য আসলে ওঁর নিষ্ঠা, পরিশ্রম, নিরন্তর জ্ঞানচর্চার দাম, যার কোনওটাই তোমার নেই। তুমি চুরি করে বড়লোক হতে চেয়েছিলে। তাও এমন একটা লোকের কাছ থেকে চুরি, যিনি তোমার মায়ের অপারেশনের সময় দু'লাখ ধার দিয়েছিলেন। সেটা তিনি মকুবও করে দেন মানসবাবুর হদিশ এনে দিয়েছ বলে। নীচের তলাটা মানসবাবু ভাড়া দেওয়ার জন্য ঘর পরিষ্কার করাচ্ছিলেন। ফেলেই দিতেন বাবার চিঠিপত্রগুলো।"

থামলেন দীপকাকু। ঝিনুক এতক্ষণে অপরিচিত মানুষটার মোটামুটি একটা পরিচয় পেয়ে গিয়েছে। জোরালো সাক্ষী হিসেবে ওঁকে এখানে উপস্থিত করেছেন দীপকাকু। ঝিনুক হঠাৎ খেয়াল করে নবারুণবাবুর বডি ল্যাঙ্গোয়েজ ধীরে-ধীরে বদলে যাচ্ছে, চাপা তৎপরতা। ঝিনুকের অবজার্ভেশন নিখুঁত প্রমাণ করে নবারুণ সদর লক্ষ করে ছুট লাগাতে গেলেন। ঝিনুক প্রায় উড়ে গিয়ে ওঁর শার্টের কলারটা ধরল। টেনে এনে দাঁড় করাল আগের জায়গায়। ঘর থেকে বেরিয়ে অবশ্য পালাতে পারতেন না। আশুদা ধরত।

দীপকাকু বলতে শুরু করলেন, "পালিয়ে পার পাবে না নবারুণ। ফোনে তুমি যা কথা বলেছ, শেখরবাবু সব রেকর্ড করে রেখেছেন। তুমি এখানে আসার পর থেকে সব কথাই রেকর্ড হচ্ছে। শাস্তি কপালে নাচছে তোমার।"

চোখমুখের অবস্থা খুব খারাপ নবারুণবাবুর। বোঝাই যাচ্ছে ভিতর থেকে ভেঙে পড়েছেন। এবার বাইরে থেকে পড়লেন, দৌড়ে এসে পা জড়িয়ে ধরলেন দীপকাকুর। বললেন, "প্লিজ, আমাকে পুলিশে দেবেন না। পদ্মনাভবাবু খুন হননি। ন্যাচারাল ডেথ। আমি ওঁকে ঘুমের ওষুধ খেতে বলেছিলাম, কোনও ইঞ্জেকশন দিইনি। স্ট্যাম্পটা আমি চুরি করেছিলাম, ফেরত দিয়ে দিচ্ছি। ক্ষতি তো কিছু হল না। আমাকে ক্ষমা করে দিন। পুলিশে দিলে আমার সংসারটা ভেসে যাবে। আপনি বাড়িতে গিয়ে তো সব দেখেছেন।"

দীপকাকু বললেন, "মৃত্যুটা স্বাভাবিক হলেও মৃত্যুর জন্য অনেকাংশে তুমি দায়ী। ডাকটিকিটটা চুরি হওয়ায় প্রচণ্ড শক পেয়েছিলেন পদ্মনাভবাবু। ধাক্কাটা আর সামলে উঠতে পারেননি। যাক, তোমাকে শোধরানোর একটা সুযোগ দিচ্ছি, স্ট্যাম্পটা শেখরবাবুর কাছে রেখে যাও। আর শাস্তি বলতে, পদ্মনাভবাবুর থেকে নেওয়া দু'লাখ টাকাটা প্রতি মাসে কিছু করে শোধ করবে অরিন্দমবাবুকে। এ ধরনের কাজ আর কখনওই করবে না। জানবে তোমার উপর আমার নজর থাকবে।"

দীপকাকুর নির্দেশ মতো শার্টের তলায় থাকা বুকের কাছ থেকে বড় একটা এনভেলপ বের করলেন নবারুণ। এর ভিতরে নিশ্চয়ই সেই দুষ্প্রাপ্য খামসমেত ডাকটিকিট। সেটা শেখরবাবুর টেবিলে রেখে মাথা নিচু করে সদরের দিকে এগিয়ে গেলেন নবারুণ। চৌকাঠ পেরোতে যাবেন, দীপকাকু বলে উঠলেন, "বাইরে বেরিয়ে দৌড়তে যেও না।"

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে দীপকাকুর দিকে তাকালেন নবারুণ, 'কেন' জিজ্ঞেস করার সাহস হল না। সদর পেরোলেন।

স্ট্যাম্পটা এখন দীপকাকুর কাছে। গাড়িতে বাড়ি ফেরা হচ্ছে। বাবা প্রথমে কথা শুরু করলেন, "শাস্তিটা বড় লঘু হয়ে গেল না?"

কথাটা দীপকাকুর উদ্দেশে বলা, তাই উনি উত্তর দিতে থাকলেন আশুদার পাশের সিটে বসে, "আইনত শাস্তি দেওয়ার মতো ব্যবস্থা পদ্মনাভবাবুই করে যাননি। স্ট্যাম্প কালেক্টাররা জেনারেলি তাদের কালেকশনের ইনশিওরেন্স করায় না। কোন স্ট্যাম্পের কী দাম বোঝাতে অসুবিধে হয় ইনশিওরেন্স এজেন্টকে। তবু পদ্মনাভবাবু এই দামি স্ট্যাম্পটার আলাদা করে বিমা করিয়ে রাখতে পারতেন। তাতে কোর্টে সহজে প্রমাণ করা যেত, স্ট্যাম্পের মালিক পদ্মনাভবাবু। দামি স্ট্যাম্পের যে লিস্ট পদ্মনাভবাবু নিজের হাতে লিখে রেখেছিলেন, তাতেও স্ট্যাম্পটার এবং মানসবাবুর থেকে আরও যে সব স্ট্যাম্প-পোস্টকার্ড পেয়েছিলেন, তার কোনও উল্লেখ ছিল না। রেকর্ডিং করা স্বীকারোক্তি শুনিয়ে কোর্টে কাউকে অপরাধী সাব্যস্ত করা একটা লং প্রসেস। ওই সময়ের ফাঁকে স্ট্যাম্পটা হাতের বাইরে চলে যেতে পারত। পদ্মনাভবাবু যেহেতু কোনও ঠোস প্রমাণ রাখেননি, যে স্ট্যাম্পটা ওঁর। তাই আমি স্থির করি জাল বিছিয়ে ডাকটিকিটটা আগে উদ্ধার করি। শাস্তি আর একটু বেশি দেওয়া যেত নবারুণকে, মেডিকেল শপে গিয়ে ওর কীর্তি বলে দিলেই চাকরিটা যেত। ওদের সংসারটা সত্যিই ভীষণ কষ্টের মধ্যে পড়ত।"

ফের বাবা জানতে চাইলেন, "এবার বলো, অপরাধীকে শনাক্ত করলে কী করে?"

দীপকাকু শুরু করলেন বলতে, "স্ট্যাম্প ডিলার শেখর সামন্তর সঙ্গে দেখা করে আমি জানতে পারি ফোনে পদ্মনাভবাবু স্ট্যাম্পটার দাম যাচাই করার পরের দিনই শেখরবাবুর কাছে আর-একটা ফোন আসে পাবলিক বুথ থেকে, ওই স্ট্যাম্পের ডিটেল্স দিয়ে দাম জানতে চাওয়া হয়। শেখরবাবু দাম বলেন এবং জানিয়ে দেন তিনি কিনতে আগ্রহী। সঙ্গে এটাও বলেন, স্ট্যাম্প কোথা থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে, হিস্ট্রি জানাতে হবে। বেআইনি বা চোরাই হলে দাম পঁচিশ থেকে পাঁচে নেমে যাবে।

"এত কম দামে বেচতে চায়নি চোর। অপেক্ষা করছিল বেশি টাকার লোভে। আমি ততক্ষণে বুঝে গিয়েছি চোর উৎপল হাজরা নয়। স্ট্যাম্পটা তার দেখা হয়ে ওঠেনি। পদ্মনাভবাবু তাকে মানসবাবুর কাছ থেকে সংগৃহীত ডাকটিকিটগুলো দেখানোর জন্যই ডেকে পাঠান। ডাকার কিছুদিন পর উৎপলবাবু পদ্মনাভবাবুর কাছে যান। তার আগেই চোর ফোন করেছে শেখর সামন্তকে। উৎপলবাবু যেদিন গেলেন স্ট্যাম্প দেখতে, পদ্মনাভবাবুর মুড ভীষণ অফ ছিল। কাজের লোক সরলা ঝিনুককে বলেছে, পদ্মনাভবাবু উৎপল হাজরাকে দোর থেকে বিদায় দিতে চেয়েছিলেন। বোঝাই যাচ্ছে, স্ট্যাম্পটা খোওয়া গিয়েছে সেদিন অথবা তার আগের দিন টের পেয়েছেন পদ্মনাভবাবু। তার আগেই স্ট্যাম্প দেখতে উৎপলবাবুকে ডেকে ফেলেছেন। এর পরই আমার মাথায় আসে শ্রাবণী রায়ের কথা। তিনি এবং মহুয়া আন্দাজ করছেন জলখাবারের সঙ্গে মেশানো হয়েছিল কিছু। এই মেশানোর সূত্রে আমার মনে হল, পদ্মনাভবাবুকে অচেতন না করে স্ট্যাম্পটা হাতানো যাবে না। উৎপল হাজরা যখন স্ট্যাম্পটা দেখেইনি, জলখাবারে কিছু মেশাতে যাবে কেন? ঝিনুককে দেওয়া সরলার আর-একটা ইনফরমেশন এখানে কাজে লেগে গেল, শেষ যেদিন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

[illegible]চেনায় সেখানে উপস্থিত নবারুণ, দুশ্চিন্তা পর পদ্মনাভবাবুকে দেখতে ওর শোয়ার ঘরে যায়। ঘুমোচ্ছিলেন পদ্মনাভ। সেই সুযোগে কাজটা সারে নবারুণ। যদিও সে এখন বলছে, ঘুমের ওষুধ খেতে বলেছিল। সুগার টেস্টের জন্য ব্লাড নেওয়ার সময় ঘুমের মাইল্ড ইঞ্জেকশনও দিয়ে থাকতে পারে। তবে এটা নিশ্চিত, সেদিন মোটেই পদ্মনাভবাবুর ব্লাডপ্রেশার বেশি ছিল না। ঘুমের ব্যবস্থা করার জন্যই প্ল্যানটা সাজিয়ে ছিল নবারুণ।"

বাবা জিজ্ঞেস করলেন, "স্ট্যাম্পটা যে অত দামি, জানল কী করে নবারুণ? আলমারির চাবি কোথায় থাকে, তাও তো ওর জানার কথা নয়। স্ট্যাম্পটা চুরি করতে হলে আলমারি খুলে নির্দিষ্ট অ্যালবামটা বের করতে হবে নবারুণকে।"

উত্তরে দীপকাকু বললেন, "এর জন্য অনেকটাই দায়ী পদ্মনাভবাবু নিজে। মানসবাবুর বাবার জমানো চিঠিপত্র থেকে মূল্যবান স্ট্যাম্প-পোস্টকার্ড পেয়ে অতি উৎসাহে ডেকে পাঠান নবারুণকে। যেহেতু সংগ্রহের হদিশ দিয়েছিল সে। স্ট্যাম্প, পোস্টকার্ডগুলো তাকে দেখান, সবচেয়ে বেশি দামি স্ট্যাম্পটা দেখানোর সময় নিশ্চয়ই বেশি উৎসাহ প্রকাশ করে ফেলেছিলেন পদ্মনাভবাবু। দাম কোনওটারই বলেননি। কৃতজ্ঞতাবশত নবারুণের লোনটা মকুব করে দেন। নবারুণ বুঝে যায় স্ট্যাম্প-পোস্টকার্ডগুলো যথেষ্ট দামি। সবচেয়ে দামি খামসমেত স্ট্যাম্পটাকে টার্গেট করে সে। সংগ্রহগুলো নিশ্চয়ই পদ্মনাভবাবু নবারুণকে উপরের ঘরে এনে দেখিয়েছিলেন। আলমারির চাবি কোথায় থাকে তখনই সে দেখে নেয়।"

থামলেন দীপকাকু। থেমেই আছেন। অধৈর্য হয়ে ঝিনুক বলে উঠল, "তারপর?"

ফের শুরু করলেন দীপকাকু, "বাইক নিয়ে আমাদের ফলো করা, ঝিনুককে অ্যাটাক করা, আসলে ভয় দেখাতে এসেছিল। সব ঘটনাই ঘটছিল অরিন্দম নন্দীর পাড়ায়। প্রথমে ভেবেছিলাম ফলোটা অরিন্দম নন্দী করিয়েছেন। নবারুণকে চিহ্নিত করার পর বুঝলাম, সব কিছুই ওর নির্দেশেই হচ্ছিল। আমাদের তদন্তে নামতে দেখে অস্বস্তি বাড়ছিল নবারুণের। এর পর আমি ফোন করলাম নবারুণ যে মেডিকেল শপে কাজ করে, তার মালিককে। নবারুণের বাড়ির ঠিকানা, ওর সেল নাম্বার নিলাম। নবারুণের অবর্তমানে গেলাম ওর বাড়ি। শোভাবাজারে ঘিঞ্জি এলাকায় অ্যাসবেসটস ছাদের ঘুপচি দুটো ঘর, বারান্দায় রান্নার ব্যবস্থা। বাড়িতে অসুস্থ মা, বৃদ্ধ বাবা, অবিবাহিত দিদি, বোন কলেজে পড়ে। নবারুণ একাই রোজগেরে। ওর বাবার সঙ্গে আলাপ জমালাম। জিজ্ঞেস করলাম পদ্মনাভবাবুর সঙ্গে কীরকম সম্পর্ক ছিল ছেলের? উনি বললেন, পদ্মনাভবাবু তো দেবতুল্য মানুষ ছিলেন। ছেলেকে অনেকবার সাহায্য করেছেন। এই তো কিছুদিন আগে মানস সরকারের বাড়ির চিঠিপত্রের সন্ধান দিয়েছিল নবারুণ, পদ্মনাভবাবু খুশি হয়ে দু'লাখ টাকা ধার মাপ করে দিয়েছেন। আমার স্ত্রীর অপারেশনের সময় টাকাটা নেওয়া হয়েছিল ওঁর থেকে।

"আমার পরের গন্তব্য মানস সরকারের বাড়ি। ঠিকানা নিয়েছিলাম নবারুণের বাবার থেকে। মানস সরকার এখানে যা বললেন, সেটা তো আমাকে বলেই ছিলেন, আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানা গিয়েছিল, মানসবাবুর বাবা মুখ্যমন্ত্রীর দফতরের আর্দালি ছিলেন। আমি বুঝে গিয়েছিলাম সার্ভিস লেখা গাঁধীজির স্ট্যাম্প উইথ এনভেলপ উনি নিজের ডিপার্টমেন্ট থেকে পেয়েছিলেন। চিঠি ছাড়া ফাঁকা খাম। সরকারি মহলের উপরের দিকে ওই খামে চিঠি চলাচলি হত। মানসবাবুর বাবা হয়তো উচ্চপদস্থ কারও থেকে ওটা উপহার পেয়েছিলেন অথবা ডিপার্টমেন্টে অযত্নে পড়েছিল। চাকরিজীবনের স্মৃতি চিহ্ন হিসেবে নিয়ে এসেছিলেন। নবারুণের সমস্ত অপকীর্তি জানিয়ে মানস সরকারকে বলে এসেছিলাম, আপনাকে আমার সাক্ষী হিসেবে কাজে লাগবে।"

দম নিতে থামলেন দীপকাকু। ফের বলতে লাগলেন, "প্ল্যান সাজালাম। আবার গেলাম শেখর সামন্তর কাছে। নবারুণের ফোন নম্বর দিয়ে বললাম, 'একে ফোন করে বলুন তোমার কাছে সার্ভিস লেখা গাঁধীজির স্ট্যাম্প সমেত খাম আছে আমি জানি। তুমিই আগে আমাকে একবার ফোন করেছিলে। নিজেকে আর লুকোতে পারবে না। দেখো, তোমার ফোন নাম্বার জোগাড় করে ফেলেছি। গোয়েন্দা লেগেছে তোমার পিছনে, দোকানে ফোন করে খবর নিয়েছে তোমার। বাড়িতেও গিয়েছে। মানস সরকারের থেকে স্ট্যাম্পটা পেয়েছেন পদ্মনাভবাবু, তোমার বাবা বলেছেন গোয়েন্দাকে। সবচেয়ে বড় প্রমাণ রেখে গিয়েছেন পদ্মনাভবাবু নিজে। স্ট্যাম্পটার সঙ্গে নিজের একটা ভিডিও তুলে রেখেছেন। অচিরেই ধরা পড়বে তুমি। গোয়েন্দা শুধু অপেক্ষা করছে ওষুধটার নাম জানার জন্য। সুগার টেস্টের জন্য ব্লাড নেওয়ার সময় তুমি যে ওষুধের ইঞ্জেকশন দিয়েছিলে পদ্মনাভবাবুকে, যার এফেক্টে ক'দিন বাদেই মারা যান উনি। তোমাকে একেবারে খুনের আসামি হিসেবে ধরতে চাইছে গোয়েন্দা। যদি বাঁচতে চাও, স্ট্যাম্পটা পাঁচ লাখ টাকায় বিক্রি করে দাও আমাকে।'

"আমার বলে দেওয়া কথাগুলোই নবারুণকে বলেছিলেন শেখর সামন্ত। এত সব মিলে যেতে দেখে ঘাবড়ে যায় সে। ফাঁদে পা দেয়। ভিডিওগ্রাফি যেহেতু সত্যিই নেই। ইঞ্জেকশনে ভরা ঘুমের ওষুধেরও কোনও প্রমাণ নেই হাতে। তাই মানস সরকারের মতো সাক্ষীকে রেখেছিলাম সঙ্গে, ওকে দেখে যাতে ঘাবড়ে যায় নবারুণ। স্বীকার করে নিজের দোষ। শেখরবাবুর সঙ্গে নবারুণের ফোনালাপ এবং আজকের কথা সবই অবশ্য শেখর সামন্ত রেকর্ড করেছেন।"

সবটা বুঝিয়ে থামলেন দীপকাকু। বড় করে শ্বাস ছাড়লেন বাবা। ঝিনুকও বেশ রিলিফ ফিল করছে। তার মনে আর কোনও প্রশ্ন নেই। বাবা বলে উঠলেন, "আচ্ছা দীপঙ্কর, তুমি তো এক ঢিলে দুই পাখি মারলে। একজনের থেকে কেস নিলে, উপকৃত হল দু'জন। ফিজ় কি দুই পার্টির থেকেই নেবে?"

দীপকাকু বললেন, "একজন আদ্যন্ত সৎ, নির্লোভ মানুষকে নিয়ে যা টানাহ্যাঁচড়া গেল। সব সময়ই তাই হয়। আমি আর টাকা-পয়সা নিয়ে ওদের সঙ্গে দর কষাকষি করব না। আমার একটাই তৃপ্তি, সেই মানুষটা এবার একটা ভাল কাজের সঙ্গে যুক্ত হবেন। শ্রাবণী রায়ের এন জি ও গরিব পরিবারের মেধাবী ছাত্রকে স্কলারশিপ দিতে পারবে।"

বাবার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে দীপকাকু একবার পিছনের সিটের দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে রহস্যের হাসি হাসলেন। ঝিনুক বুঝে গেল হাসির মানে। দীপকাকুর হয়ে উত্তরটা সে দিল, "মোহনদাস করমচাঁদ গাঁধী। যাঁর ছবি টাকাতেও থাকে, স্ট্যাম্পেও..."

অপ্রস্তুত অবস্থায় পড়েছেন বাবা, রাগ করবেন, না হাসবেন ঠিক করতে পারছেন না। বাবাকে স্বস্তি দিতে ঝিনুক গাড়ির জানলার দিকে মুখ ফেরায়। রোদে ঝলমল করছে চারদিক। ঝিনুকের মনে পড়ে, কেসটা যেদিন এসে ছিল, ঘোর বৃষ্টি। আজ ঝিনুকদের সাফল্যে আকাশ যেন হাসছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~